প্রকাশক :
সুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬০

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক :
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দুটো কথা

না—নিছক বানিয়ে বলা কোন আজগুবি ভূতের কীর্তি-কলাপের কথা নয়, তবু মনে হবে গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন ভৌতিক। হ্যাঁ—ঐ কেমন যেন ভৌতিক—যেমন গাছ-গাছালির ছায়া-ছায়া নির্জন পথে চলতে-চলতে, কিংবা ইঁট-পাঁজুরে পুরনো কোনো বাড়িতে রাতে ঢুকলে গা ছমছম করে ওঠে। বিশেষ করে যদি লোকমুখে প্রবাদ ঘোরে—এখানে ভূতে ঘাড় মটকায়, কন্ধকাটা ঘুরে বেড়ায় কিংবা শাকচুন্নী তাড়া করে।

আচ্ছা, পরিবেশের কি কোন শরীর আছে? পরিস্থিতির? অথচ এই পরিবেশ আর পরিস্থিতি মানুষকে নিয়ে কি পুতুল খেলাই না খেলে-তা মানুষটা যতই সুস্থ, স্বাভাবিক আর সবল হক না কেন। এরা যে কোনো মানুষকে দেবতাও করতে পারে আবার দানবও করতে পারে। দেবতা হলে তো আলাদা কথা—সে আর কজন হতে পারে? উল্টোটাই হয় বেশী। আর দানব যখন হয়, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে, তাকে যে কি পরিমাণ ভীষণ করে তোলে, কি পরিমাণ অস্বাভাবিক, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, শরীর ঝিমঝিম করে। এদের এই খেলাকে ভৌতিক অশরীরী বলতে কি আপত্তি আছে কারো?

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

ভৌতিক মহল

ভৌতিক মহল
ভৌতিক মহল

॥ এক ॥

—স্যার, মি রেণর এসেছেন।

প্রকাশক জ্যাকব মারখাম টেবিলের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকালেন, তাঁর সচিবের দিকে। বললেন—আসতে দাও।

ভিতরে ঢুকলেন প্রায় তিরিশ বছরের এক যুবক। লম্বা, দোহারা গড়ন। মুখে প্রশান্তির ছাপ। পরণে ঢিলে-ঢালা স্যুট। তার ওপর কালো লম্বা ওভারকোট।

—আরে, আসুন···আসুন।—চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন মারখাম। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

করমর্দন সেরে বিশ্রামের ভঙ্গিতে চেয়ারের পিছনে, দেহটা এলিয়ে পা-দুটো সামনের দিকে টান-টান করে বসলেন রেণর—ক্লাইভ রেণর। তারপর প্রাসঙ্গিক দু-চারটে কথার পরই মারখাম জিজ্ঞাসা করলেন—নতুন বই-এর ব্যাপারে কতদূর এগুলেন? কোন প্লট কিছু ভাবলেন?

—না:।—সরাসরি বললেন রেণর।—কিচ্ছু মাথায় আসছে না।

কেমন যেন একটু হতাশ হলেন প্রকাশক মারখাম।

—সে কি?—বললেন মারখাম।—অবশ্য তাড়া দিচ্ছি না। কিন্তু এদিকে যে হাতেও আর তেমন সময় নেই। এখনও সত্যিই কিছু ভাবেন নি?

—সত্যি।—বললেন রেণর।—কোন জুতসই প্লটই মাথায় আসছে না। তারপর একটু'খন চুপ থেকে আবার একটু হেসে বললেন—তবে

নিরাশ আপনাকে হতে হবে না। আজ রাতেই আমি নর্থে যাচ্ছি গিয়েই লিখতে সুরু করে দেব।

—নর্থে যাচ্ছেন?—বিস্ময় জাগে প্রকাশকের,—কোথায়?

নরদামবারল্যাণ্ড। বললেন রেণর।—একটা বাড়ি কিনেছি, বলতে পারেন, মহল? গরমকালে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, ভালো লাগলো, দামের দিক থেকেও প্রায় জলের দাম। কিনে ফেললাম। নাম—ক্রম ম্যানর। অবশ্য এই নামই শুনলাম ওখানে।

—সে কি? একটা মহল বাড়ি কিনে ফেললেন।—বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়লেন প্রকাশক,—আপনি একা মানুষ। অত বড় প্রাসাদ নিয়ে করবেন কি? আবার তো লোকজন পুষতে হবে দেখাশোনা করার জন্যে। বোধ হয় শীগ্‌গির···

মারখামকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রেণর—না—না, ওসবের কোন চিন্তাই নেই। লোকজনের সমস্যা মিটেই গেছে। মহল বাড়িতে এক মহিলা তার ভাইঝিকে নিয়ে আছে—দেখাশোনা করে। তাদেরই রেখে দিয়েছি, আর মানুষজনের দরকার হবে না। সবকটা ঘর নাইবা ব্যবহার করলাম।

—যদি ব্যবহারই না করবেন, তাহলে, অতবড় মহল কেনার কী প্রয়োজন পড়ল?

—বললাম না, বাড়িটা দেখেই আমার কেমনমনেধরে গিয়েছিল। চারিদিক বেশ ফাঁকা, ধূ ধূ। প্রায় মাইলখানেক দূরে ছোট্ট গাঁ। নিশ্চিন্তে বসে লেখার উপযোগী জায়গা, তা ছাড়া অত সস্তায়।

—বেশ কিছু মেরামতির কাজ আছে নিশ্চয়ই।—জিজ্ঞেস করেন মারখাম।

—মোটেই না। কোথাও হাত ঠেকাতে হবে না। বাড়ি থেকে কোথাও একটু চুণও খসে পড়ে নি।—বলে একটু ইতস্ততঃ করে আবার বললেন রেণর—আসলে মহলটি বিক্রী করার ভার যাদের ওপর

ছিল, তারা অনেক চেষ্টা করেও কোন খরিদ্দারই পাচ্ছিলেন না। বোধ হয়, আমিই প্রথম।

—কেন ?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধটা একটু ঝাঁকালেন রেণর। বললেন—শুনলাম, বাড়িটার নাকি কি একটা বদনাম আছে। বহু পুরোনো বাড়ি। আজ পর্যন্ত কেউ নাকি গিয়ে থাকতে পারে নি। বছর কুড়ি আগে নাকি একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল ওখানে। দুই বাচ্চা আর স্ত্রী নিয়ে কোন এক মেজর বার্টন নাকি বাড়িটা কিনে বসবাস করতেন। মানুষটি খুব মদ্যপ ছিল। বেশী মদ খাওয়ার ফলেই হক, কি অন্য কোন কারণেও হতে পারে বার্টন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে বাচ্চা দুটোকে মেরে, স্ত্রীকে খুন করে, শেষে নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা যায়। সেই থেকে ও-বাড়ির ধারে-কাছে আর নাকি কেউ যায় নি। শুধু ঐ মহিলা আর তার ভাইঝি আছে দেখাশোনা করার জন্যে।

—শেষে ওখানটাই আপনার লেখার মনোমত জায়গা বলে মনে হল।—বললেন মারখাম। কেমন যেন শুকনো শুকনো গলা।—যাই হোক, ওসব আপনার ব্যাপার। আমার কিন্তু এবার একটা ভালো লেখা চাই। আগেব বইটা বড্ড মার খেয়ে গেল, তা আপনিও জানেন।

—এবার ভাগ্য আপনার ফিরে যাবে।—হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন রেণর।—ক্রম ম্যানর দেখার পর থেকেই আমার স্থির বিশ্বাস এবার যা লিখবো···!

কথাটা যে কতখানি সত্য হয়ে দাঁড়াবে, রেণর তখন পর্যন্ত তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

—হলেই ভাল।—ছোট্ট জবাব প্রকাশক মারখামের।

পরদিন সকালেই লণ্ডন ছাড়লেন রেণর। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে উঠে বসলেন লোক্যাল ট্রেনে। শরতের প্রায় বিকেল, মহল বাড়ির কাছাকাছি স্টেশন ফায়ারফিল্ডে এসে ট্রেন থামল। নেমে পড়লেন ক্লাইভ রেণর।

মালপত্র নিয়ে উঠলেন ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্থানীয় মানুষ। ওল্ড জিমি নামেই সকলের পরিচিত। তামাটে মুখ। টান-টান চেহারা।

—আপনিই তাহলে মহলটা কিনলেন?—ট্যাক্সি চালাতে-চালাতে বলে জিমি। শান্ত নির্জন পথ বেয়ে চলেছে ট্যাক্সি। শুনলাম, আপনি নাকি লেখক। খানা-পিনায় এবার তাহলে বাড়িটা বেশ জমে উঠবে, অ্যা!

জিমির অজ্ঞতায় বেশ কৌতুক অনুভব করলেন রেণর। বললেন—না, আমি একাই থাকব। সেটাই আমার ইচ্ছে।

—ও। তা ভাল।—বলে জিমি।—তবে নিশ্চিন্তে থাকতে পারলে হয়।

—তার মানে?—জিজ্ঞেস করেন রেণর।

—না, মানে বলছিলাম,—বলে জিমি,—বাড়িটা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত ও বাড়িতে কেউ শান্তি পায় নি। মেজর বার্টনকেই দেখুন না শেষ পর্যন্ত কী হল তাঁর! প্রথম যখন এ বাড়িতে এলেন, কেমন দিলখোলা, আমুদে মানুষ। স্ত্রীটিও ছিল সেইরকম। কথা-গুলো তাঁর যেমন ছিল মিষ্টি, ব্যবহারও সেইরকম। কিন্তু কয়েকদিন থাকার পরই দেখলাম বদলে গেলেন, একেবারে বদলে গেলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—কিরকম বদলে গেল?—কৌতূহলী হলেন রেণর।

—বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিলেন। একেবারে বাড়ি-কুনো হয়ে পড়লেন। হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-প্রমোদ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। যেন বাড়িতে কোন মানুষই নেই। ছোট্ট শিশু দুটো কী ফুটফুটে

আর ছটফটেই না ছিল। দেখতে দেখতে ঝিমিয়ে পড়ল, শুকিয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার ওপর, তাদের দেখলেই ভয় করত। তারপব এল সেই দারুণ রাত। মেজর শিশুদুটোকে খুন করল, স্ত্রীকে খুন করে নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ল। কী মর্মান্তিক। আমি কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে কোন দোষ দিই না। সর্বনেশে হল ঐ বাড়িটা। হ্যাঁ বাড়িটাই সবকটা প্রাণ খেল।

—তুমি কি বলতে চাইছ, শেষ পর্যন্ত বাড়িটাই তাদের চরম সর্বনাশ করল।—সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন রেণব।

—আমি বলছি, বাড়িটাতে দোষ আছে, ভাল নয়। কেনবার আগে যদি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হত, তাহলে তখনই একথা আমি আপনাকে বলতাম। শুধু আমি কেন আশ-পাশের অনেকেই বলত। এটা তো স্বীকাব করেন কিছু বাড়ি আছে ভাল, আবার কিছু খারাপ যেখানে বাস করলে অশান্তি ছাড়া কোনদিনই শান্তি পাওয়া যায় না। এখানকাব এই মহল বাড়ি ক্রম ম্যানর হল সেই জাতের খাবাপ বাড়ি। ঈশ্বর করুন, কথাটা মিথ্যে হোক।

প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। জিমি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল বাড়িটা—ঐ তো। সামনেই।

গুচ্ছ ফারগাছের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই বিশাল প্রাসাদ। গোধূলির আলোয় ম্লান। আকাশে সূর্যাস্তেব রক্তছড়ি। এখান থেকে দেখাচ্ছে মহল-বাড়িটাকে যেন একটা কালো নক্‌শা।

—শুনলাম, হান্না মোফাত আর তার ভাইঝিকেই রেখেছেন বাড়িতে কাজ-কম্মের জন্যে ?—বাড়ির গেটের দিকে মোড় নিতে নিতে বলল জিমি।

—হ্যাঁ,—বললেন রেণর,—আমার মনে হয়েছে, মহিলাটি যথেষ্ট কাজের।

—নিঃসন্দেহে···নিঃসন্দেহে কাজের। মোফাত আর তার ভাইঝির তুলনা হয় না।—জবাব দিল জিমি।

খট্ করে কথাগুলোর সুর এসে কানে বিঁধলো রেণর। এরকম-ভাবে বলল কেন জিমি! কিন্তু আর সে মুখ খুলল না। একেবারে মুখে যেন কুলুপ এঁটে দিল হঠাৎ।

গাড়ী এসে দাঁড়াল সদর দরজার ঝুল-বারান্দার নীচে।

—এসে গেলাম। আপনি চলুন। আপনার মালপত্র আমিই ভিতবে দিয়ে আসছি।—বলল জিমি এতক্ষণ বাদে।

॥ দুই ॥

বিশাল পাথর বসানো বাড়ি। কিন্তু কেমন যেন এলোমেলো। নীচতলায় অসংখ্য গবাক্ষ। জানালা-গুলোও অন্ধকারে ঢেকে গেছে। বাড়ীর ভিতরের বাতাসটা কী কনকনে! আর কেমন অসম্ভব থমথমে! যে কেউ-ই আসুক না এব কাছে, মনে হবে, এখনই পালাই। মনে হবে নিষিদ্ধ এলাকা।

কিন্তু এসব কিছুই মনে হল না ক্লাইভ রেণরের। বরং, ট্যাক্সির দরজা খুলে সেই গোধুলির অন্ধকারের মধ্যেও এমনভাবে তিনি এগিয়ে এলেন বাড়ির দরজার দিকে, যেন তাঁর কাছে এর কিছুই অপরিচিত নয়। এক গ্রীষ্মে এসে বাড়িটা দেখে যেমন আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, এখনও যেন সেই আকর্ষণ সমানই রয়েছে তাঁর মধ্যে।

সদর দরজা খোলাই ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল হান্না মোফাত। সামনে তার হলদে ম্যাড়মেড়ে জ্বলন্ত তেলের কুপি। কী মুখে কী দেহের গড়নে কোথাও কোন শ্রী নেই। যেন কাটখোট্টা। হলদে আলোয় তারই পিছনে হলঘরে তারই ছায়া।

রেণর কাছাকাছি আসতেই অভ্যর্থনা জানাল হান্না—গুড্ ইভিনিং। আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?

কথাগুলোর মধ্যে কোথাও এতটুকু মিষ্টতা নেই বরং যেন খরখর করে উঠল কর্কশতা।

ট্যাক্সি থেকে জিমি মালপত্র নামিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ভাড়া-পত্তর মিটিয়ে নিয়ে চলে গেল। রেণর লক্ষ্য করলেন, কেউ কারো সঙ্গে কোন কোথাও বলল না।

জিমি চলে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল হান্না। তারপর বলল—ডাইনিং রুমে চলুন। ওখানেই আপনার চায়ের বন্দোবস্ত করেছি।

বিশাল টেবিল একটা। তারই একপ্রান্তে ছোট একটা টেবিল-ক্লথ। আগুন চুল্লীতে আগুন জ্বলছে বটে, তবে এমনি দৈন্যদশা যে প্রায় না-জ্বলারই সামিল। তারই সামনে দাঁড়িয়ে সবে একটু উত্তাপ অনুভব করার চেষ্টা নিচ্ছিলেন রেণর, চমকে উঠলেন পিছনে একটা লঘু পায়ের শব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘোরালেন রেণর। দেখলেন, ফুটফুটে একটি মেয়ে; চোখে-মুখে লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে, হাতে ভারী একটা চায়ের ট্রে।

আপনা থেকেই রেণরের পা যেন এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। হাত বাড়ালেন। বললেন —দাও, আমার হাতে দাও।

মেয়েটি কিন্তু হাতে না দিয়ে পাশ কাটিয়ে টেবিলেই এনে রাখল সেটি।

রেণর দেখলেন, অল্প বয়স হলেও মেয়েটির মধ্যে বেশ একটা স্বাতন্ত্র-বোধ রয়েছে।

—আরো গরম জল বা অন্য কিছুর দরকার হলে বেলটা বাজাবেন, কেমন ?—বলল মেয়েটি।

বেশ সুরে বাঁধা কণ্ঠস্বর। কথাগুলিও গোটা গোটা। তবুও তারই মধ্যে কেমন যেন একটু খ্যাস্‌খ্যাসে। রেণরের অবশ্য তাই মনে হল।

চলে যাচ্ছিল মেয়েটি। থামালেন রেণর। বললেন—এক মিনিট। তোমার পরিচয়টা তো পেলাম না।

—আমি মিস্ মোফাতের ভাইঝি।

—মানে, এই বাড়ির তদারকিতে যে হান্না মোফাত রয়েছে তুমি তারই ভাইঝি?

—হ্যাঁ।

এবার রীতিমত বিস্মিত হবার পালা রেণরের। অমন এক কাটখোট্টা পুরুষ-মুখো হান্না মোফাতের এমন এক অপরূপ সুন্দরী ভাইঝি? ভাবতেই পারা যায় না। পরিচয় না পেলে রেণর তা কোনদিন ভাবতেও পারতেন না।

—তোমার নাম?

—ডায়না।

নিঃশব্দে চলে গেল মেয়েটি। ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা। একা রেণর। মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে একটু'খন তাকিয়ে, এবার চায়ে চুমুক দিলেন। ঘরে কুপীর আলো।

সবেমাত্র শেষ হয়েছে চা-পান, হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুনের চুল্লী। ছুটতে সুরু করল ফুলকি। কুপীর আলো ছাপিয়ে ফুঁসে উঠল তার শিখা। ঘরময় যেন সুরু হয়ে গেল আলোর নৃত্য।

আগুন-চুল্লীতে একমাত্র কয়লা ফাটার শব্দ ছাড়া একেবারে নিস্তব্ধ চতুর্দিক। কোথাও কোন শব্দ নেই—না বাইরে; না বাড়ির ভিতরে। যেন একটা বুক-চাপা নিস্তব্ধতা থমথম করছে চারদিকে।

রেণর নিজেই জানতে পারেন নি, কখন এই মহল বাড়ির পুরাতন মালিকের চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।—মেজর বার্টন আর তাঁর সেই হতভাগ্য পরিবার।

ভাবতেও বিস্ময় জাগে একদিন এই টেবিল ঘিরেই তারা সকলে খানাপিনা করেছিল; এই ঘর একদিন তাদের কল-কাকলীতে মুখর

ছিল। আর, আজ। আজ আর তাদের কেউ নেই।

সিগারেটের ধোঁয়া আর আলো-ছায়ার নৃত্য ঘরময়। রেণর কী ওরই মধ্যে সেই শিশুদুটির নাচ দেখতে চাইছেন নাকি? বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আসে রেণরের মন। মন হারিয়ে যায় যেন ঐ ছায়া-ছায়া নাচের মধ্যে।

একটা অস্পষ্ট খসখসে আওয়াজে দারুণ চমকে ওঠেন রেণর। চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। শক্ত মুঠিতে চেয়ারের পিছনটা ধরে প্রায় বোঁ করে মুখ ঘোরান পিছনে।

হান্না মোফাত। হাতে দুটো চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। আচ্ছা মহিলা তো? দরজায় টোকা দিতে কি হয়েছিল। কী দারুণ চমকেই না তাঁকে দিয়েছিল।

—আপনার এই চিঠিগুলো সন্ধ্যের ডাকে এইমাত্র এল।—বলে মহিলাটি সেগুলো রেণরের হাতে দিয়ে আবার চলে গেল। ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

আবার চেয়ারে বসলেন রেণর, সুস্থির হয়ে। চিঠিগুলো খুললেন। একটা লিখেছে হোয়াইটলে বে থেকে তাঁর মাসি। লিখেছেন: 'পুত্র আমার—আশা করি ইতিমধ্যে তুমি তোমার নতুন বাড়িতে পৌঁছে গেছ। আমি আসছে বেস্পতিবার গিয়ে দিনকয় থেকে তোমার সব গোছগাছ করে দিয়ে আসব। অন্যান্য কথাবার্তা সাক্ষাতে হবে। তোমার পরের বই কবে বের হচ্ছে। স্নেহাশীষ নিও।—ইতি— মাসি বার্থা।'

চিঠিটা পড়া শেষ করে খামের ভিতর পুরতে পুরতে নিজে মনেই বলেন রেণর—ঠিক আছে। ভালই হল।

সম্ভ্রান্ত-বংশের মহিলা এই বার্থা। ধরণ-ধারণে কিন্তু বড় সেকেলে। রেণরের ভিক্ষে-মা। অবস্থাও যথেষ্ট ভাল।

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলতেই রেণরের মেজাজ উঠল খিঁচিয়ে। লণ্ডনের এক সুদখোর পাওনাদারের চিঠি। চিঠির ভাষাও একেবারে চরম।

লিখেছে : 'প্রিয় মহাশয়—আপনার সঙ্গে আমাদের হিসেবমত পাওনা তিন হাজার পাউণ্ড আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে না পেলে আদালতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।—ইতি—জেমস্ লুইস্।'

তিরিক্ষি হয়ে উঠলেন রেণর। কুঁচকে গেল তাঁর চোখ, কপাল। চিঠিটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে উঠে এলেন আগুন-চুল্লীর কাছে। ছুঁড়ে দিলেন সেটা আগুনের মধ্যে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, যতক্ষণ না সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এই কদিনের মধ্যে তিন হাজার পাউণ্ড। একি বাতুলতা নয়? তিনশ' বা ঐরকম কাছাকাছি হলে না হয় মাসি বার্থার কাছ থেকে কিংবা বই এর দরুণ আগাম নিয়ে মিটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিন হাজার পাউণ্ড—অসম্ভব!

নতুন এই মহল বাড়িতে এখনও একটা রাতও কাটান হল না। পা দিতে না দিতেই জেমস্ লুইস আর তার তাগাদা। যত্ত সব! ঠিক করলেন রেণর এখন ওসব নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামাবেন না তিনি।

সরে এলেন আগুন চুল্লীর পাশ থেকে। সেকেলে একটা কল বেল। বাজালেন রেণর। শুনতে পেলেন নিস্তব্ধ বাড়ির অন্দর-মহলের কোন্ প্রান্ত থেকে, কে জানে, ভেসে এল তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

মুহূর্তে যেন ডায়না এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়।

ইতিমধ্যে নিজেকে খুবই স্বাভাবিক করে নিয়েছেন রেণর।

—বাড়িটা একবার ঘুরে দেখব, ডায়না।—খুব ভালভাবেই রেণর বললেন ডায়নাকে।

—খুব ভাল কথা। আসুন।—বলে ডায়না।

রেণর দেখলেন টেবিল থেকে চায়ের কাপ, ট্রে তুলে নিল ডায়না। তারপর বলল—এখুনি যাবেন ত'?

—হ্যাঁ এখনি। আমি প্রস্তুত।—বলেন রেণর।

—তাহলে চলুন। আগে দোতলায় যাওয়া যাক।

—উত্তম কথা। চল।

দোতলাতেই রেণরের শোবাব ঘর। ডায়না তাঁকে প্রথমেই নিয়ে গেল সেই ঘরে। সুপ্রশস্ত ঘব। সুন্দরভাবে সাজানো আসবাবপত্র। সেকেলে একটা চার-পায়া খাটে বিছানা। জানলায় ঝালর। তারই নীচে ছোট্ট একটা টেবিল। একগুচ্ছ ক্রিসেনথামাম ফুল তাতে। বাতিদানে জ্বলছে বাতি।

দেখে খুবই ভাল লাগল রেণরের।

মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বললেন রেণব—চমৎকার! এই ফুলগুলোর জন্যে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

—ওগুলো বাগান থেকেই সংগ্রহ করা।—বলে, ডায়না বলল,—এই ঘরেই মিসেস বার্টন খুন হয়েছিলেন।

চাবুকের মত চকিতে মুখ ঘুরিয়ে ডায়নার ওপব ফেটে পড়লেন যেন বেণব—এসব কথা এখন কোথা থেকে এল? কী বলতে চাও তুমি?

—আমার মনে হল আপমি হয়ত জানতে চাইবেন।—কিছুমাত্র বিচলিতা না হয়ে বলল ডায়না।—আমি যদি না শুনিয়ে রাখি, হয়ত অন্য কেউ আপনাকে শোনাতে পারে। তখন···। যদি বলেন, তাহলে অন্য একটা ঘর না হয়···।

—না। দবকার হবে না।—বেশ রুক্ষ মেজাজেই বললেন রেণর।—আমি এই ঘরেই থাকব।

পরক্ষণেই নিজের মেজাজের জন্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে ডায়নার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রেণর। ছি....ছি .. এটা ঠিক হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল রেণরের,—আচ্ছা অতবড় একটা ঘটনার কথা অমন শান্তভাবে ছুম্ করে কিভাবে বলল মেয়েটি? এ কি আজব মেয়ে!

রেণরের ঠিক পিছনেই ডায়না। সামনে ড্রেসিং-টেবিলের আয়না। আয়নায় চোখ পড়তেই দেখতে পেলেন রেণর, মেয়েটির

মুখে কেমন যেন এক কুটিল হাসির রেখা। কেমন যেন মুখটা। চমকে উঠলেন রেণর। ডায়না কি তাহলে, আসলে…।

রেণরের কাছে এই মুহূর্তে এটা যেন একটা আবিষ্কার। হিমহিম করে উঠল তাঁর পিঠের শিরদাঁড়া। আতঙ্কের যেন মৃদু শিহরণ খেলে গেল তাঁর সর্বাঙ্গে।

মেয়েটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর দিকে। রেণরের মুখের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মেয়েটির চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে আরো নির্মম হয়ে উঠল। কিন্তু তা ঐ ক্ষণিকের জন্যেই। রেণর যে মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকালেন সেদিকে, দেখলেন, তার লেশমাত্রও নেই সে মুখের কোথাও। মুক্তোর মত দাঁতে ছড়িয়ে রয়েছে মৃদু হাসি। কমণীয় সেই মুখ। প্রশ্ন জাগে রেণরের মনে, তবে কি তাঁর চিন্তার মধ্যে মুহূর্তের জন্যে কোন মতিভ্রম ঘটে গেল!

ভ্রু-র ওপব দিয়ে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন রেণর। কিছুক্ষণ আগেও হাতটা তাঁর কাঁপছিল। দেখলেন, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে গিয়েছিল।

—মিসেস বার্টনের প্রসঙ্গ তুলে আপনাকে বিব্রত করার জন্যে আমি দুঃখিত।—শান্তস্বরে বলল ডায়না।—ক্ষমা করবেন। আমার বলা ঠিক উচিত হয়নি।

—হঠাৎ এইভাবে তোমার ওপর ক্ষেপে ওঠাও আমার উচিত হয়নি।—জবাবে বললেন রেণর।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যাপারের ওপর ঐখানেই ইতি টেনে দিলেন রেণর।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে নীচতলায় আবার নেমে এলেন তিনি। খাবার ঘরের পাশেই সকালের মেজাজী বৈঠকখানা ঘর। দেখে ভাল লাগল। বললেন, এই ঘরটাকে আমার লেখা-পড়ার ঘর করে নেব। আর খাবার ঘরটাও মাঝে মাঝে শোবার ঘর হয়ে যাবে।

নীচের তলা ঘুরে দেখতে-দেখতে জিজ্ঞেস করে ডায়না—রান্নাঘর দেখবেন নাকি ?

—মন্দ হয়না। চল দেখে আসি।

ডায়নাকে অনুসরণ করে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে রেণর এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। দেখলেন, বেত-মোড়া সেকেলে একটা চেয়ারে বসে হান্না মোফাত। রেণর ঘরে ঢুকতে মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকাল মাত্র হান্না। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না বা তাঁকে কোন আপ্যায়নও জানাল না। তারই সামনে বসে হতশ্রী এক বৃদ্ধা জিপসী মহিলা। মাথায়, এক মাথা পাকা চুল, কোটরে চোখ। গায়ের চামড়ায় মোটা-সোটা নীল রেখা। দাঁত নেই মুখে একটাও। তারই মাঝে চেপে ধরে আছে তামাক-ভরা কালো একটা মাটির পাইপ।

ঘরে ঢুকতেই মুখ থেকে ধোঁয়া-কালো পাইপটা নামিয়ে নিল সেই জিপসী মহিলা। কোটরাগত ফ্যাকাশে জোলো চোখ তুলে তাকাল সে হান্নার দিকে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—এই বুঝি তোমার নতুন মনিব ?—তারপর রেণরকে উদ্দেশ্য করে বলল—ক্রুম ম্যানরে হাড়গিলে মশায়ের শুভাগমন হ'ক।

দারুণ ঔদ্ধত্য তো এই মহিলাটির! মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন রেণর।

—কে তুমি ?—প্রায় খিঁচিয়ে ওঠেন রেণর।

—আমি ? আমি যাযাবর বুড়ি মেগ। মরূপেত থেকে এসে আছি।—বলল জিপসী মহিলা, যেন সাপের হিস্‌হিস্ শব্দ।—হান্নার বন্ধু আমি। ভাল ভবিষ্যৎ বলতে পারি। চাঁদি ফেল, তোমারও ভবিষ্যৎ আমি বলে দেব।

—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।—প্রায় তেড়ে গেলেন রেণর। —যাও, বেরিয়ে যাও।

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হান্না। দারুণ কঠিন আর

কর্কশ এবার তার মুখ চোখ।

—রান্নাঘর আমার এক্তিয়ারে।—বাজখাঁই গলায় বলল হান্না। —এখানে আমার যাকে খুশী আপ্যায়ন করব। এখান থেকে কাউকে বেরিয়ে যেতে বলার অধিকার আপনার নেই।

॥ তিন ॥

হান্নার এই কথায় একটু বিস্মিত হলেও, খুব একটা বিস্মিত হলেন না রেণর। মহলে ঢোকা এবং হান্নাকে দেখার মুহূর্ত থেকেই মনে মনে আশঙ্কা করছিলেন, এমনি একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ত তাঁকে হতে হবে। কিন্তু, সেটা যে আজ এবং এই মুহূর্তে, এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, তা ভাবতে পারেন নি রেণর।

বাড়িতে পা দেবার পর থেকেই নিজের কাছে নিজেকে কেমন যেন নতুন লাগতে শুরু করেছে রেণরের; কেমন যেন অস্বাভাবিক, খিটখিটে—যা তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোনদিনই ছিল না। রেণরের কেমন যেন মনে হতে লাগল, এই মহল বাড়ি যেন ভর করেছে তাঁর ওপর। নিজের খুশীমত কাজ যেন নিজেই করিয়ে নিতে শুরু করেছে। তার প্রভাবের কাছে, তিনি যেন, চেষ্টা নিয়েও বারবার অসহায় হয়ে পড়ছেন।

—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবে।—সামলাতে পারলেন না রেণর নিজেকে। ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন।—আমি যখন বলেছি বেরিয়ে যেতে, তখন বেরিয়ে যেতে হবেই।

মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেণর। হান্নার সঙ্গে মোকাবিলায় যখন এখনই নামতে হয়েছে, তখন যা হবার এখনই হয়ে যাক।

—আর তোমার যদি আপত্তি থাকে, তল্পি-তল্পা গুটিয়ে তক্ষুণি চলে যেতে পার।

একেবারে যেন চুপসে গেল হান্না মোফাত। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ। মুখে তার এমন ভাবে কুলুপ পড়ে গেল যে নাক দিয়ে ঘন-ঘন সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে সুরু করল।

এতক্ষণ বাতিদানটা হাতেই ধরেছিল ডায়না। এবার নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। মুখে তার কৌতুকের আভাস।

—তাহলে আমার কোন বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করার কোন অধিকার আমার থাকবে না, বলছেন।—মুখ খুলল কর্কশ হান্না।

—না। আমার অনুমতি ছাড়া নয়।—স্পষ্ট জবাব রেণরের।

হান্নার হাতের মুঠো দুটো কঠিন হয়ে উঠল। চোখে আগুনের ঝলক।

—মেগের সঙ্গে আমার পরিচয় তিরিশ বছরেরও বেশী।—স্পষ্ট দাবি যেন হান্নার কণ্ঠে।—এই অঞ্চলের সব বাড়িতেই ওর অবাধ গতি।

—এ বাড়িতে নয়।—ঠিক তেমনি স্পষ্ট জবাব রেণরের।

এমনভাবে হান্নার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারার জন্যে মনে মনে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করতে সুরু করছিলেন রেণর।

—মেগের অপরাধ?—উত্তেজনায় কাঁপতে সুরু করেছে হান্নার গলা।

—কোন অপরাধ নেই, শুধু ঔদ্ধত্য ছাড়া।—তেমনি স্পষ্ট রেণর। —তাছাড়া আমি যখন ওকে বেরিয়ে যেতে বলেছি, তখন বেরিয়ে ওকে যেতেই হবে।

হান্না যে নিজের উত্তেজনাকে সামলে নিল, তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

—আপনি তাহলে এই ধরণের মানুষ।—শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল হান্না।

—হ্যাঁ, আমি এই ধরণের।—কাটা-কাটা জবাব রেণরের। —আমার মতামত আমি জানিয়ে দিয়েছি। এ নিয়ে আর তোমার

সঙ্গে বাক্যলাপ করতে চাই না।

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ি মেগ। অসংখ্য ভাঁজে ভরা বিশাল স্কার্টের কোথায় যেন পাচার করে দিল সেই কালো তামাকের পাইপটা। তারপর বলল—না, না। আমার জন্যে তোমায় অসুবিধেয় পড়তে হবে না হান্না। আমাকে যখন চলে যেতে বলছে, আমি চলেই যাচ্ছি। এ বাড়িতে আর ঢুকবো না।

এবার সাপের মত হিলহিলে চোখে তাকাল সে রেণরের দিকে।

—শোন।—একমুখ থুতু ফেলে বলল রেণরকে।—হাজার চাঁদি দাও, আমি আর এমুখো হচ্ছি না। দেখতে তো বেশ ভদ্দর-সদ্দর, বেশ ভব্যযুক্ত। আমি বলে যাচ্ছি তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। তোমার যদি দেখার চোখ থাকত, দেখে ভয়ে সেঁদিয়ে যেতে।

আরও উচ্চগ্রামে ভাঙ্গা কাঁসির মত বেজে উঠল তার কণ্ঠস্বর ঃ

—এই বাড়িতে আগে খুন হয়েছে। আবার খুন হবে তোমারই হাতে। আমি বেশ স্পষ্ট তা দেখতে পাচ্ছি, তোমার কপালের রেখায়। কুড়ি বছর আগে বুড়ো বার্টন যখন মরল, তখনই বলে রেখেছিলাম তুমি আসছ এই বাড়িতে। এসেছ-ও। তুমি ভাবছ এ-বাড়ি তোমার ; তুমি এর মালিক! বোকামি…তোমার বোকামি। এ-বাড়ির মালিক তুমি নও। এই বাড়িই তোমার মালিক। বুঝবে একদিন, আমি কি বললাম। এই বাড়ি…হ্যাঁ-হ্যাঁ…এই বাড়ি একদিন তোমার ঘাড় ধরে তোমাকে নরকের গর্তে পাঠিয়ে দেবে। দেখো…দেখো, আমার কথা মেলে কিনা?

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেগ।

—চললাম।—বলল সে।—চলি হান্না। চলি ডায়না।

জিপসী বুড়ি মেগ কাঁপা-কাঁপা গলায় কীসব একগাদা কথা বলে গেল ঠিক বুঝতে পারলেন না রেণর।

—এসব কি কথা বলে গেল বুড়ি?

হান্না, ডায়না দুজনেই নিশ্চুপ। কেউ কোন কথা বলল না।

রান্না ঘর থেকে খাবার ঘরে ফিরে এলেন রেণর। আগুনের পাশে আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

এই মহলে পা দিয়ে অবধি এসব কী সুরু হল? প্রথমেই সুদখোর মহাজনের চিঠি। তারপরই হান্না মোফাতের সঙ্গে বচসা। তার পরেই আবার বুড়ি জিপসীর সঙ্গে কাটা-কাটা কথা।

আচ্ছা, বুড়ি মেগ কী বলে গেল?

আমার কপালে নরঘাতকের চিহ্ন···এই বাড়িতেই আমি আসব ···এই বাড়িই হবে আমার মালিক···।

যত্ত সব আবোল-তাবোল। কিন্তু, সত্যিই কি? কোথায় যেন একটু একটু মিল লাগছে না? গরমকালে প্রথম মহলটাকে দেখেই তিনি প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কেন? এখনও যেন ভাল-লাগাটা সেই এক রকম রয়েছে। যেন ভাবতেই পাচ্ছেন না, এই মহলটা তাঁর কাছে নতুন। কিভাবে? পা দেওয়ার পর থেকে সন্ধ্যে পেরোতে না পেরোতেই এত ঘটনা ঘটে গেল, তবু তাঁর মনে তেমনভাবে রেখাপাত করছে না কেন? মনে হচ্ছে, এটাই তো স্বাভাবিক।

তবুও এরই মাঝে যেন একটু অশান্তি, একটু অস্বস্তি জাগে রেণরের মনে। আচ্ছা, তাঁর স্বভাবে তো কখনও কোন উত্তেজনা ছিল না। রান্না-ঘরে কিছুক্ষণ আগে যেভাবে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, সত্যিই বিস্ময়ের। মনেই পড়ে না, এভাবে কখনও কোথাও এই ধরণের অভব্য-উত্তেজনা, তাঁকে উত্তেজিত করেছিল কি না। তাহলে তাঁর মধ্যে হঠাৎ এই পরিবর্তন কিভাবে এল?···!

॥ চার ॥

সে রাতে রান্নাঘরের আগুন-চুল্লীর পাশে বসে থাকলেন ক্লাইভ রেণর অনেক রাত পর্যন্ত।

হান্না মোফাত এবং ডায়নাও চলে গেছে যে যার ঘরে। রেণর কিন্তু শোবার ঘরে যাবার কোন তাগিদই অনুভব করলেন না।

চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়িটা কেমন যেন থমথম করছে। মনে হল রেণরের, সত্যিই অস্বাভাবিক থমথম করছে বাড়িটা—যেন একটা ঘন কালো পর্দা ঢাকা। চাপা-চাপা। তবুও এখানেই তিনি রয়েছেন—যেন এক নিরাপদ আশ্রয়।

নিরাপদ !···নিরাপত্তা···?

আশ্চর্য ! হঠাৎ এই চিন্তাটা রেণরের মাথায় এল কেমন করে ? ক্লাইভ রেণরের নিরাপত্তার প্রয়োজন ? সে কি ঐ জেমস্ লুইস আর তার তিন হাজার পাউণ্ডের দাবি থেকে ? তাই হবে, বোধ হয়।

হ্যাঁ ঠিকই তো। মি. লুইস আর তার ভীতি-প্রদর্শন থেকে একটু নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে বৈ কি। ভাবলেন রেণর।

এত টাকা এই মুহূর্তে তিনি পাবেন কোথা থেকে ? কিন্তু যোগাড় তো তাঁকে করতেই হবে ঋণমুক্ত হবার জন্যে···নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। বার্থা মাসির কাছে—কোন সম্ভাবনা নেই। মাসি স্টক-এক্সচেঞ্জে টাকা খাটানো ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, বুঝতেও চান না।

···কোনো অভাব নেই মাসির। প্রভূত ধন-সম্পত্তি' উত্তরাধিকার সূত্রে রেণরই অবশ্য সবকিছু পাবেন। মাসিও বরাবর সেই কথাই বলে এসেছেন। মাসির প্রতিশ্রুত কয়েকটা দাতব্য কাজে যা কিছু খরচ হবে। তা বাদে মাসি মারা গেলে সবই তো রেণরের।

আচ্ছা, মাসির কি ইতিমধ্যে মরার কোন সম্ভাবনা আছে? চিন্তাটা হঠাৎ করেই যেন এসে গেল রেণরের মাথায়। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। লাঠি ছাড়া একপাও চলতে পারেন না। কিন্তু এখনও কলজের যা জোর! ভারী অসুখ-বিসুখ কিছু একটা না হলে খুব শীগ্‌গির মরবেন বলে তো মনে হয় না।

এদিকে লুইস মাত্র সাতদিন সময় দিয়েছে।

প্রায় নিভে আসা চুল্লীর আগুনে সিগারেটের অবশিষ্টটুকু ছুঁড়ে দিয়ে এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রেণর। বাতিটা জ্বেলে হাতে নিয়ে উস্‌কে দিলেন। তারপর শোবার ঘরে যাবার জন্যে, খাবার-ঘরে দরজা যেই পার হতে যাবেন, মনে হল, কে যেন ফোঁ···স্···স্··· করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করলেন রেণর। কিন্তু, আর শোনা গেল না।

—'চিমনীর বাতাস।'—বিড়বিড় করে নিজেকেই নিজে শোনালেন বেণর।

কিন্তু, কোথা থেকে আসবে বাতাস? বিলক্ষণ জানেন রেণর গাছ-পালার পাতাটুকু পর্যন্ত আজ নড়েনি। তাহলে···!

আর কোনদিকে কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে রেণর উঠে গেলেন দোতালায় শোবার ঘরে। অহেতুক এই মনে হওয়ার জন্যে, নিজেই মুখ টিপে একটু হেসে নিলেন।

পরদিনটাই ছিল বৃহস্পতিবার। দুপুরের খাবার আগেই মাসি বার্থা এসে হাজির হলেন। একমাথা সাদা চুল। ফ্যাকাসে। বয়স প্রায় সত্তর ছুঁই-ছুঁই।

বিকেলে মাসিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মহলের চারদিকে দেখালেন রেণর। কিন্তু তাঁর মনে হল, মাসি যেন দেখে খুশি হতে পারলেন না।

—আচ্ছা মাসি, আমার যেন মনে হচ্ছে, তুমি দেখে ঠিক খুশি হতে পারছ না?—বলেই ফেললেন রেণর।—কেন বলত?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।—বললেন বার্থা।—ছাখ বাপু, আমি তোমার মত কল্পনা-বিলাসী নই, তা তুমি জানো। আমার মনে হচ্ছে, মহলটা ঠিক সুবিধের নয়। কেমন যেন একটা ছমছমে মহল। এখানে, এই বাড়িতেই কিছুকাল আগে মারাত্মক কি এক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল না?

—হ্যাঁ। তবে তার কোন প্রভাব নিশ্চয়ই, এই মহলে পড়েনি।—প্রতিবাদ-জানান রেণর।—পরিবেশটা তো এখানকার বেশ ভাল।

—তাহলে তো বাছা, আমায় বলতেই হয় যে পরিবেশ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান এখনও তোমার জন্মায় নি।—বললেন বার্থা।—আমি কিন্তু এই বাড়িতে এইভাবে থাকতে পারব না। অসুস্থ হয়ে পড়ব।

—তুমি নিশ্চয়ই এখনই চলে যাবে না মাসি?—রেণরের কণ্ঠে আকুতি।

—না…না। এক সপ্তাহ থাকব যখন বলে এসেছি, থাকব।—বললেন বার্থা।—তবে যদি কোন খদ্দের পাও, এ-মহল এখনি বিক্রী করে দাও। এটা আমার হলে, আমি তাই করতাম, রেণর।

—ঠিক আছে মাসি। আমি নিশ্চয়ই ভাববো।—প্রতিশ্রুতি দেন রেণর।

সপ্তাহের মধ্যেই রেণর তাঁর ভাবার কাজ শেষ করেছিলেন। যেভাবে তা শেষ করেছিলেন, বার্থার তা ছিল স্বপ্নেরও অতীত। জেমস লুইসকে যতই অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে থাকুন না কেন রেণর, উপেক্ষা করতে পারেন নি। খুব সাঙ্ঘাতিক মানুষ। এই মহল ক্রোক করে, তাঁরই নাকের ডগায় বিক্রী করে দিয়ে, তার টাকা সে ঠিক আদায় নিয়ে যাবে।

যতই দিনের পর দিন যাচ্ছে, এই মহলের ওপর রেণরের মোহ ততই বেড়ে যাচ্ছে। তাই একে হারাবার ভয়ে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতে থাকেন রেণর।

সেই বৃহস্পতিবারের রাত এমনকি তার পরের দুটো রাতও খাবার ঘরে একা একা রেণর কাটালেন অনেকক্ষণ ধরে। মাসি বার্থা, ডায়না, হান্না মোফাত যে যার শোবার ঘরে চলে যাবার পরও স্থির হয়ে খাবার ঘরে বসে বেশ কিছুটা করে সময় কাটিয়েছেন বেণর। আর আগুণ চুল্লীর পাশে বসে থেকেছেন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে।

অদ্ভুত চিন্তা। রেণবের মত মানুষের পক্ষে সত্যিই সে-সব অস্বাভাবিক চিন্তা। চিন্তা খালি পাক খেয়ে ঘুরেছে জেমস্ লুইসকে ঘিরে। যে ভাবেই হ'ক লুইসের ব্যাপারটা সময়ের মধ্যেই শেষ করে দিতে হবে। চোখের সামনে হঠাৎ যেন বেণরের ভেসে উঠল ডায়নার মুখ। অদ্ভুত কিন্তু নিঃসন্দেহে অপরূপা। শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূবে এই নিভৃত মহলে এসে রেণর যেন সব কিছু দেখতে সুরু করলেন এক নতুন চোখ দিয়ে।

রবিবার। রাত সাড়ে নটা। প্রতিদিনেব মত সেদিনও পা-পা করে বার্থার ঘরে গেছেন, শুতে যাবার আগে প্রথামত 'গুড্ নাইট' জানাতে। আধখোলা বার্থার দরজা, একটু ঠেলতেই খুলে গেল। আগুনের দিকে মুখ করে আরাম কেদারায় অর্ধ-শয়ান বার্থা, দরজার দিকে পিছন করে। ঢিলেঢালা ড্রেসিং গাউন, পরনে রাতের পোশাক, পায়ে চপ্পল। চেয়ারের পাশে ছোট্ট টেবিলে একটা খালি গেলাস। দুধ ছিল নিশ্চয়ই। শুতে যাবার আগে রোজই খান। এটা তাঁর অভ্যাস। আজও খাওয়া শেষ করেছেন।

দরজা খুলে এগিয়ে এলেন রেণর। মাসি কিছুমাত্র নড়াচড়া করল না। সেকেলে ধরণের তাঁর কোঁচকানো চুলের একটা গোছা ঝুলে পড়েছে তাঁর বুকের ওপর। দেখলেন রেণর। মনে হল তাঁর, যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

যেন জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছেন, এই ভাবে একটু এগিয়েই, নিঃশব্দে আবার পিছিয়ে এলেন রেণর। যেন পিছিয়ে আসতে বাধ্য

হলেন। দৃষ্টি তাঁর একবার সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিল-বার্থার প্রশান্ত মুখ; শণ দিয়ে তৈরী গরম ড্রেসিং গাউনের ওপর দিয়ে।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন রেণর। দেখলেন, আগুনের এত কাছে আরাম কেদারা নিয়ে বার্থা বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে ঝাঁঝড়ি থেকে জ্বলন্ত একটা কয়লা যদি কোনরকমে ছিটকে আসে সঙ্গে সঙ্গে পোশাকে আগুন লেগে যাবে। শনে একটু আগুন লাগার অপেক্ষা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। আর সেই জিনিস দিয়েই তৈরী পোশাক তাঁর মাসির পরণে।

রেণরের হাত কঠিন হয়ে উঠল। ধমনীতে রক্তের প্রবাহ যেন বেড়ে গেল। নিজের হৃৎস্পন্দন যেন নিজেই রেণর হঠাৎ শুনতে সুরু করে দিলেন। আগুনের আলোয় যে কেউ রেণরের সেই সাদা-মাটা, উদাসীন মুখটাকে দেখলে, দেখতে পেতেন, যেন হিংস্র একটা নেকড়ে-মুখ এই মুহূর্তে মুখখানা তাঁর কঠিন করে তুলেছে।

মাসি, হান্না মোফাত আর নিজে ছাড়া এ-বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। জানতেন রেণর। মেয়েটা বাইরে যেন কোথায় গেছে। তাই হান্না নিজেই আজ রাতে খাবার ঘরে তাঁকে খাবার দিয়ে গেছে। হান্না নিশ্চয়ই এখন তার রান্না ঘরে।

অতর্কিতে রেণরের হাত চলে গেল তাঁর জ্যাকেটের বুক পকেটে। ঠিক সেই সময়েই নড়ে-চড়ে উঠলেন মহিলা, ঘুমের মধ্যেই একটা শ্বাস ফেললেন। চমকে, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন রেণর। জেগে উঠল নাকি, মাসি।

না, জেগে ওঠেন নি বার্থা। মুহূর্ত কাল ঠিক তেমনিভাবেই পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন রেণর। তারপর পকেট থেকে পুরোনো একটা চিরকুট বের করে আনলেন। মেলে ধরলেন সেই আলোয়। জেমস লুইসের রসিদ।

কাঁপতে সুরু করেছে রেণরের আঙুল। তবুও নিঃশব্দে হিসেবের সেই কাগজটা পাকিয়ে সরু একটা ছিলের মত করে নিলেন রেণর।

তারপর চুপি চুপি সেই ছিলেটা জলন্ত কয়লার আগুনের দিকে বাড়িয়ে ধরিয়ে নিলেন।

শিখা নিয়ে জ্বলে উঠেছে পাকানো কাগজটা। রেণর ফিরে মহিলার ড্রেসিং গাউনের শনে সেটা ঠেকিয়ে দিতেই জ্বলে উঠল পোশাকের প্রান্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্বলে ওঠার আগেই বাকি টুকরোটা আগুন-চুল্লীতে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে অতি দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর এক এক লাফে কার্পেট বিছানো দুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যখন প্রায় নীচে নেমে এসেছেন, ওপর ঘর থেকে তখন আর্তনাদের পর আর্তনাদ এসে আছড়ে পড়তে লাগল তাঁর কানে।

ইতিমধ্যে দু-লাফে বেণর একেবারে তাঁর খাবার ঘরের দরজায়। পিছনে অন্ধকার—অন্ধকার সিঁড়ি। ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরের ভেতব।

হঠাৎ বারান্দায় সরু হলদে আলোর রেখা পড়ল। দেখলেন, খুলে গেল রান্না ঘরের দরজা। দোতালা থেকে আসছে সেই যন্ত্রনা কাতর আর্তনাদ।

—কি হল?···কি·হল?—রেণর বিস্মিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন।

দ্রুতগামী হান্নাকে অনুসরণ করে রেণরও ছুটলেন দোতালার দিকে।

॥ পাঁচ ॥

কী সাঙ্ঘাতিক আর মর্মান্তিক সে দৃশ্য। দোতালায় বার্থার ঘরে ঢুকেই যেন চমকে উঠলেন রেণর।

আরাম-কেদারা আর দরজার মাঝামাঝি মেঝেয় পড়ে মাসি বার্থা। রাতের পোশাক, ড্রেসিং গাউন পুড়ে ছাই। পোশাকের

কিছু কিছু অংশ দলা পাকিয়ে পড়ে আছে বার্থার নিথর দেহের আশপাশে।

বিবর্ণ হান্না মোফাত। বিছানার পাশের টেবিলে হলদে আলোয় সেইরকমই দেখাচ্ছিল হান্নার মুখ।

—আগুন ধরে গেছে।—ধরা গলায় বলল হান্না।—চুল্লীর খুব কাছেই বসেছিলেন বোধ হয়।—তারপর রেণরকে বলল—ধরুন, বিছানায় তুলে দিই।

একদিকে হান্না মোফাত, আর একদিকে রেণব। ধরাধরি করে বার্থাকে তুলে শুইয়ে দিল বিছানায়।

রেণর ফিরে এলেন খাবার ঘরে। মদ ছোঁয়া বন্ধই করে দিয়েছিলেন রেণর। কিন্তু এই মুহূর্তে একটু নেশা করার ইচ্ছে তাঁর প্রবল হয়ে উঠল। ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে একটু সোডা মিশিয়ে এক-চুমুকে নিঃশেষ করলেন পাত্রটা।

গ্লাসটা নামিয়ে টেবিলে রাখতে যাবেন, ঘরে ঢুকল হান্না।

—এখন এটা পুলিশী তদন্তের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।—বলল হান্না।

—আমার ত তাই মনে হয়।—ছোট্টকথায় বেশ জোর দিয়েই একমত হলেন রেণর।

হান্না চলে গেল। সিগারেট ধরিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকে নিলেন রেণর। আঙ্গুলগুলো তখনো কাঁপছিল।

যাক, তাহলে সব শেষ হল! একটা অস্বচ্ছার চিন্তার তরঙ্গ উঠল রেণরের মাথায়। দেশলাই কাঠিটা চুল্লীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। তাহলে বার্থা মাসি একেবারেই সরে গেল। আর…আর তিনি নিজেই তাঁকে সরিয়ে দিলেন।

আচ্ছা, বার্থাকে যে তিনি ঐভাবে পুড়িয়ে মারবেন বা একেবারে সরিয়ে দেবেন, এ-চিন্তা কি কখনো তাঁর মাথায় এসেছিল? রাতে তখন দোতলায় বার্থার ঘরে গুড্-নাইট জানাবার জন্যে গিয়ে

ঢুকেছিলেন—না, হলফ করে বলতে পারেন রেণর, তখনো পর্যন্ত ওসব কোন চিন্তাই তাঁর মাথায় ছিল না।

তাহলে ? বার্থাকে আগুন-চুল্লীর পাশে আরাম-কেদারায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে হঠাৎ—কেমন করে যেন হঠাৎ এসে গেল ঐ চিন্তাটা মাথায়। যেন কাজটা করার জন্যে দারুণ ভাবে হঠাৎ প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন কি ? হ্যাঁ। তা-ও তো করেছিলেন। তবু পারলেন না। বার্থাকে শেষ করে দিলেন। তিনি, হ্যাঁ তিনি, ক্লাইভ রেণর, লেখক ক্লাইভ রেণর খুন করলেন তাঁর মাসিকে।

মনে হল তাঁর কানের পর্দায় এই মুহর্তে যেন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলল সেই জিপসী বুড়ির কথাগুলো। চমকে উঠলেন রেণর। কী যেন বলেছিল বুড়ি ?

—তোমার কপালে নরঘাতকের চিহ্ন…।

আচ্ছা, ঐ বুড়ি কেমন করে জানল। একটা ডাইনী বুড়ি তাঁকে চিনে ফেলল, আর রেণর নিজে নিজেকে চিনতে পারলেন না—কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

আচ্ছা, মাসির এইরকম ভাবে মরার সঙ্গে ডাইনীবুড়িটা তাঁকে জড়িয়ে দেয়নি ত ? এই কথাটা মনে আসতেই রেণর যেন ভয়ে শিউরে উঠলেন। সে পারে। বেশ, তাই না হয় করল ; তাতে তার কি লাভ। পরমুহূর্তেই ঐ চিন্তা দূর হয়ে গেল রেণরের মাথা থেকে।

মাসিটা যেমন বাচাল, তেমনি বোকা। বাড়িটার মধ্যে কি দেখল, যে আবোল-তাবোল বকতে সুরু করে দিল। এমন নিরালা এমন সুন্দর এক পুরোণ মহল, বলে কি না, ভাল নয়! খারাপটা কোথায় ?

যদি মনোরমই না লাগবে, তাহলে যে জঘন্য অপরাধ সে রাত্তে রেণর করলেন, তার জন্যে তাঁর মনে কোন ভয় বা অপরাধ বোধ জাগছে না কেন ? বরং যা করলেন, তার জন্যে এত তৃপ্তিই বা

অনুভব করছেন কিভাবে? রেণর কোনভাবেই অনুমান করতে পারলেন না পুরোনো এই কালো মহল কেমন ভাবে তাঁর চরিত্রকে বদলে দিচ্ছে।

নিয়ম-মাফিক তদন্ত একটা হবে। তারপর বার্থার ঐ শরীরটা মাটির তলায় সৎকার হয়ে যাবে। তার···পর? উত্তরাধিকার সূত্রে রেণর একদিন দেখবেন, তিনি প্রভূত ধনের মালিক হয়ে গেছেন।

এখন জেমস লুইসকে আর কে গ্রাহ্য করে? বুড়িটার সৎকার করতে কত খরচ হবে? পঞ্চাশ থেকে একশ' পাউণ্ড। না-ও করতে পারেন। অত ধুমধাম করে সৎকার করার মত মহিলা, বার্থা নন।

যে দাতব্য-গুলোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে, তা বাদ দিলে···। অর্থের পরিমাণের কথা মাথায় আসতেই আবার চিন্তায় পড়ে যান রেণর। অত টাকা নিয়ে কি করবেন তিনি? ভ্রমণ···দেশভ্রমণ? না। কি প্রয়োজন? এখানে ত বেশ ভালই আছেন। গাড়ি কিনবেন? নাঃ। গাড়ির অনেক ঝামেলা। ভাল লাগবে না। ফূর্তী করবেন? দূর। জুটবে কতকগুলো মোসায়েব। এমন শান্ত বাড়িতে তাদের নিয়ে হৈ-হট্টগোল। না, তা চলবে না। এই মহল তাঁর নিজের। এখানে কাউকে প্রশ্রয় দেবেন না।

আর ভাবনা-চিন্তা করতে না পেরে রেণর এবার ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ওপরের ঘরে একটা মরা—মৃত তাঁরই মাসি বার্থা। তবুও শোবামাত্র নিশ্চিন্ত ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন রেণর। একটানা ঘুম যখন ভাঙ্গল, হান্না মোফাত তখন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে।

প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে গেলেন রেণর, তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বার্থার মৃত্যু-সংবাদ টেলিগ্রাম করার জন্যে।

॥ ছয় ॥

রেণর যেরকমটি অনুমান করেছিলেন, পরদিন সেইভাবেই নির্ঝঞ্ঝাটে তদন্ত হয়ে গেল। তিনি দিলেন নিজের জবানবন্দী। হান্না দিল তার নিজের। তদন্তকারী অফিসার দেখলেন, দুজনেই ওপর থেকে আর্তনাদ শুনে একই সঙ্গে প্রায় ছুটে এসে দেখেছিলেন, আগুনে পুড়ে মেঝের ওপর মরে পড়ে আছেন বার্থা।

ডাঃ ম্যাকটার্ভিস তাঁর পরীক্ষার ফলাফলও জানালেন। অন্য কোন আঘাতে নয়, পুড়েই মারা গেছেন বার্থা—দুর্বিপাক। করোণার নির্দ্বিধায় সৎকারের হুকুম দিয়ে যাবার সময় রেণরকে সমবেদনা জানিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন সমবেত আত্মীয়বর্গের কাছে। প্রাথমিক পর্ব মিটে গেল।

সেইদিন বিকেলেই হোয়াইটলে বে-তে বার্থার সৎকার হয়ে গেল। শোকচিহ্ন ধারণ করার ব্যাপারে একমাত্র রেণরই পরেছিলেন কালো পোশাক।

ব্যাস। সবকিছু মিটে গেল সুশৃঙ্খলে।

সেই রাত্রিটা ক্রম ম্যানরেই কাটালেন রেণর। পরদিন সকালেই চলে গেলেন নিউ ক্যাসেলে। মাসির সম্পত্তি দেখাশোনা করেন গ্রিমস্ এণ্ড গ্রিমেট কোম্পানি তারই কৌশুলী গ্রিমেটের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে।

সেখানে গিয়ে প্রতিশ্রুত দাতব্য অর্থ বাদ দিয়ে রেণর দেখলেন, একমাত্র উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি বুড়ির নব্বই হাজার পাউণ্ড অর্থের মালিক হয়েছেন।

মহলে ফিরে আসতে রেণরের সন্ধ্যে হয়ে গেল। ফিরেই দেখলেন প্রকাশক জ্যাকব মারখামের চিঠি।

খুলে পড়তে সুরু করলেন:

'প্রিয় রেণর,—জানি না আপনি লেখার কাজ সুরু করেছেন কিনা? আর কিন্তু হাতে সময় নেই বললেই চলে। একটু তাড়াতাড়ি করবেন। কতখানি এগোলেন, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

আশা করি ইতিমধ্যেই ক্রুম ম্যানরে সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই মহলটা যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি মনের মতই হয়েছে।

আপনার—'জ্যাকব মারখাম।'

চিঠিটা পড়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন রেণর। মনে হল রেণরের, এর প্রত্যুত্তর দেবার কোন প্রয়োজন এখন আর তাঁর নেই। অর্থের অনটন আর তাঁর নেই। বই বিক্রীর টাকার ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করার কোন প্রয়োজনই ত' আর তাঁর নেই।

তবুও লেখার ইচ্ছে জাগল মনে। আর এমনভাবে সেই বাসনা উদগ্র হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে, যে মনস্থ করে ফেললেন, যা কিছুই হ'ক আজ রাতেই তিনি লেখা সুরু করে দেবেন।

তদন্ত, সৎকার থেকে সুরু করে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আর কোথাও কোন বাধা-বিপত্তি নেই। নিশ্চিন্ত। প্লট? অসম্ভব রোমাঞ্চকর এক কাহিনীর প্লটও তিনি পেয়ে গেছেন। এমন প্লট কেউ কল্পনাও করতে পারে না। দারুণ বই হয়ে যাবে একটা। এতদিন ধরে যতগুলো বই লিখেছেন তার সব-কটাকে ছাড়িয়ে যাবে। হৈ-হৈ পড়ে যাবে চারিদিকে।

এখনই লিখতে বসে যাবার একটা প্রচণ্ড তাড়া যেন অনুভব করলেন রেণর। দুরন্ত সে তাড়া আর কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। আগুন-চুল্লীতে আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন টেবিলের কাছে।

চেয়ারে বসে কাগজ টেনে নিয়ে, কলম বের করে খুব দ্রুত প্রথমেই লিখলেন বই-এর নাম:

"ভৌতিক মহল"

পরের একটানা দুটো ঘণ্টা কাগজের ওপর কলমের খস খস শব্দ ছাড়া ঘরের চতুর্দিক নিস্তব্ধ। হাওয়ার মত কলম ছুটে চলেছে প্রায় কাগজ ছিঁড়ে।

পাতার পর পাতা মুহূর্তে ভরে যেতে থাকল মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে। খুব দ্রুত জমে উঠতে লাগল প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি।

তিনি নায়কের নামকরণ করলেন ক্লড রয়স্টন। কতকটা তাঁরই নামের কাছাকাছি। তাতে কি এসে গেলো! কাহিনীটা জড়িয়ে তো তাঁকে নিয়েই।

রয়স্টন তাঁরই মত একজন লেখক। সভ্য-ভব্য তাঁরই মত ভদ্র-বংশের। আচারে-আচরণে কোথাও তার কোন বৈষম্য নেই। তাঁরই মত ধর্মভীরু।

একটা ছুটির দিনে রয়স্টন বেড়াতে বেরিয়ে একটা বাড়ি দেখল। শহর থেকে অনেক দূরে বেশ নির্জন জায়গায় সুন্দর এক পুরোণো মহল। তার নাম হল গ্রেলিংস্। দেখামাত্রই মহলটা রয়স্টনের খুব ভাল লেগে গেল।

গ্রেলিংস কিনে, লণ্ডন শহরের ধুলোবালি ঝেড়ে রয়স্টন উঠে এল সেখানে বসবাস করতে। এসেই তার মনে হল, সে দারুণ তৃপ্ত। এযাবৎকাল এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষে যেন নিজেরই বাড়িতে এসে উঠল। পুরাণো এই মহলটায় এসেই তার মনে হল কেবলমাত্র পাথর, কাঠ আর আস্তর দেওয়া একটা পাকাবাড়িই নয় এটা। এটা জীবন্ত। এর একটা আত্মা আছে।

নিরালা এই মহল-বাড়িতে আসার পরই পুরোণো সব ধারণা যেন বদলে যেতে শুরু করল রয়স্টনের। যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল সম্মান, ভদ্রতা এসবের কোন মূল্য

নেই। এই বোধগুলো মানুষকে সংকীর্ণ করে দেয়, কোন প্রত্যাশা পুরণ করে না।

এই মহলই তাকে যেন পাঠ দিল নতুন করে, সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের।

সন্ধ্যার আড়ালে সে যখন একা-একা বসে থাকত মহলের ঘরে, মনে হত বেশ সপ্রেম উত্তপ্ত কোন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আছে সে। আর শুনতো অহরহ ফিসফিস—আইন, নিয়ম, শৃঙ্খলা সব ভুয়ো··· জীবনটাকে জবুথবু করে দেয়। পাপ? সে আবার কি জিনিস? পৃথিবীতে কোথাও পাপ বলে কিছু নেই।

মন দিয়ে সব শুনতো রয়স্টন। শুনতে শুনতে উৎসুক হয়ে উঠত। সজাগ কান পেতে আবার শুনতো। ঠিক, ঠিক! যত সব বাঁধন! মিথ্যে···ভুয়ো। কোন মূল্য নেই ওসবের। প্রস্তুত হয়ে উঠল মন। ধীরে ধীরে নিজেকেই নিজে নতুন করে তৈরী করে নিল। মহল যেন তার অপরিসীম প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ রয়স্টনকেই নতুন আর এক রয়সটনে তৈরী করে ফেলল। মানুষ—তবুও অতিমানব।

মহলে অবশ্য একা ছিল না রয়স্টন। বাড়িটা দেখাশুনা করার জন্যে ছিল একজন পরিচারিকা আর তার মেয়ে। খানা-পিনা তৈরী থেকে তার তদারকিও করত তারা। মা-টা ছিল কাটখোট্টা; পুরুষ-পুরুষ মুখ আর কথাতেও কর্কশ। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভারী মিষ্টি। যেমন চোখ-মুখ, তেমনি গড়ন। মেয়েটিকে খুব ভাল লেগেছিল রয়স্টনের। কিন্তু ওদিকে মন দেবার আগেই, হঠাৎ আর এক চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল সে। একবার অনটনে পড়ে কিছু টাকা ধার করেছিল সে। পাওনাদারের কাছ থেকে পেল কড়া তাগাদা। এখনই টাকা মিটিয়ে দিতে হবে, নচেৎ গ্রেলিংস বিক্রী করে তার প্রাপ্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড সে আদায় করে নেবে।

রয়স্টনের এক পিসি ছিল। বেশ ধনী। নিঃসন্তান সেই

বিধবার সঞ্চিত অর্থের একমাত্র উত্তরাধিকার ছিল রয়সটন। সেই পিসি একদিন এল গ্রেলিংসে থাকার জন্যে। ইতিমধ্যে পুরোনো এই মহলের কাছ থেকে নতুন পাঠ নেওয়া শেষ হয়ে গেছে রয়স্‌টনের। ভাবল, আরো কত বছর পরে বুড়ি মরবে, তারপর তার উত্তরাধিকার। কে জানে আরো কত পরমায়ু আছে এই বুড়ির। অথচ, এখনই তার অর্থের প্রয়োজন। মন যেন বলে দিল রয়স্‌টনকে—ওসব অর্থ ত' তোমারই। মিছামিছি ভেবে কষ্ট দিচ্ছ কেন নিজেকে। তোমার টাকা যেভাবে হ'ক তুমি যোগাড় করে নেবে, এতে তোমার অপরাধ কোথায়? কিন্তু, আইনত, বুড়ি না মরলে তো ও টাকা আমার নয়।···কে বললে? তোমারই টাকা··· বুড়ি যখের মত আগলে রেখেছে। আর আইন? দূ···র···! ওটা ত' গলি-ঘুঁজি।

সুতরাং এক রাতে, পিসি যখন তার শোবার ঘরে চুল্লীর পাশে আরাম কেদারায় বসে আগুনের আমেজ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, চুপি চুপি রয়স্‌টন গিয়ে তাকে সেখানে খুন করল। খুন···মানে পুড়িয়ে মারল। তার পোশাকে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেল নিজের ঘরে। সেই আগুনে একটু একটু করে পুড়ে মরল তার বুড়ি পিসি।

রয়স্‌টনকে কেউ সন্দেহও করতে পারল না। পিসির প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়ে ভাগ্য তার ফিরে গেল। আরো ভাল লেগে গেল তার সেই মহলটিকে। সেই মহল হয়ে উঠল তার অকৃত্রিম বন্ধু, তার অভিভাবক, তার পরিচালক।

কাগজের বুকে রেশের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে ক্লাইভ রেণরের কলম। নিজেই ঠিকমত জানেন না, কি লিখে চলেছেন তিনি। শব্দের পর শব্দ, কথার পর কথা যেন আপনা থেকেই এসে যুগিয়ে

যেতে লাগল তাঁর কলমে। একটুও থামতে হল না, ভাবতে হল না।

পিসি মহলে খুন হয়েছে—পুড়ে মরেছে। সুতরাং একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তও হল।—লিখলেন রেণর।

নিস্তব্ধ রাত। খাবার ঘরে বসে রয়স্‌টন লিখে চলেছে একমনে। হঠাৎ, কানে এসে বাজল দরজায় টোকার শব্দ। ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল পরিচারিকা। রয়স্‌টন মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। এই মুহূর্তে তার মনে হল, পরিচারিকার মুখটা যেন ঠিক ডাইনির মত।

—আপনার লেখায় ব্যাঘাত করতে চাই না।—বেশ খ্যান-খেনে গলায় বলল মহিলা—তবুও গোটাকয় কথা বলতে চাই।

দারুণ চমকে উঠলেন রেণর। এমন ঝাঁকুনি দিয়ে কলম তাঁর থেমে গেল যে এক ঝলক কালি ছিটিয়ে পড়ল কাগজের বুকে। ডাইনিং রুমের দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলে হান্না মোফাত ঢুকল ঘরে।

—আপনার লেখার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না।—খ্যাসখেসে গলায় বল হান্না,—তবু গোটাকয় কথা বলতে চাই।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে রেণর তাকালেন তাঁর দিকে। নামালেন চোখ কাগজের দিকে। এইমাত্র যে কথাগুলি লিখেছেন, তা বেশ বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে।

এ-কী! ঠিক যে কথাগুলি এইমাত্র লিখলেন, সেইগুলিই হান্নার মুখে। আঙুলগুলো কেঁপে উঠল ; শির শির করে উঠল শিরদাঁড়া।

রেণর আবার তাকালেন হান্না মোফ'তের দিকে। দরজা ভেজিয়ে সে ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর কিছুটা এগিয়ে এসেছে।

—কি চাই?—রুক্ষ রেণর।

—মাসির টাকার ওপর আপনার খুব লোভ জেগেছিল।—বলল হান্না।

—এসব কি আজে-বাজে কথা এখানে বলতে এলে ?—মেজাজ চড়তে থাকে রেণরের।

—টাকার লোভে আপনি তাঁকে খুন করেছেন।—বলল হান্না মোফাত।

কিছুক্ষণের জন্যে দুর্বিষহ নিস্তব্ধতা। নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে মহিলা। লক্ষ্য করলেন রেণর। হঠাৎ মুখটা তাঁর যেন রক্তশূন্য হয়ে গেল।

তারপর চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রেণর।

—কি বলতে চাইছ তুমি ?

—কি বলতে চাইছি, তা আপনি বুঝতেই পারছেন।—শান্ত স্বর মহিলার—পিসি মরার আগেই আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন। আর আপনিই তাঁর পোশাকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছেন।

—না।—চিৎকার করে ওঠেন রেণর। মুখ লাল হয়ে ওঠে রাগে আর উত্তেজনায়।—এসব মিথ্যে কথা বলে কি ভয় দেখাতে চাও আমাকে ? আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনার অর্থ।

—মিথ্যা যে বলছি না, তা প্রমাণ করে দিতে পারি।

কটমট করে রেণর তাকালেন তার দিকে। ডাইনি কী কিছু জানতে পেরেছে ?

—তুমি বলছ, তুমি প্রমাণ করে দিতে পার। কি প্রমাণ ?

—বলছি।—ঠিক তেমনি খ্যাসখেসে কণ্ঠ হান্নার। রেণরের দিকে তেমনি স্থির দৃষ্টি।—তখন রাত সওয়া-ন'টা, আমি আপনার পিসির ঘরে গরম দুধের গ্লাস নিয়ে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম তখনি ক্লান্ত হয়ে তিনি ঝিমোচ্ছেন। আগুন-চুল্লীটা আমিই ঝেড়ে দিই। কি শুনলেন ? আগুন-চুল্লীটাকে আমিই ঝেড়ে গনগনে করে দিয়ে আসি। তারপর আমি নীচুতলায় আমার রান্নাঘরে ফিরে আসি। তখন ঠিক সাড়ে ন'টা। ঠিক সময়টা কেমন করে বলছি ? ঘড়ি দেখেছিলাম। কারণ ডায়না আর বব ফারগাসের খেতে আসার

সময় হল কিনা, দেখবার জন্যেই, ঘড়ি দেখেছিলাম। তার মিনিটকয় পরেই ওপর থেকে আপনার পিসির আর্তনাদ শুনতে পেলাম। তার পর আমরা দুজনেই প্রায় একইসঙ্গে ওপরে গিয়ে যা দেখেছি, তা আপনাকে নিশ্চয়ই বলার প্রয়োজন হবে না। দুজনে ধরাধরি করে তাঁকে বিছানায় শোওয়াবার পর, আপনি ছুটেছিলেন ডাক্তাব ডাকতে। আপনি চলে যাবার পর আমি গিয়েছিলাম চুল্লীর কাছে দেখতে যে কিভাবে জ্বলন্ত কয়লা ছেটকালো। দেখলাম চুল্লীতে না ছিল কোন কয়লা, এমন কি কোন অঙ্গারও ছিল না। দেখলাম, যেরকম ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গিয়েছিলাম, সেইরকম পরিষ্কাবই আছে। আর দেখলাম, একটা কাগজের ছিলে—আধপোড়া।

ধক্ করে উঠল রেণরের বুকটা। আতঙ্কে যেন ভিতরটা মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল। তিনি স্থির নিশ্চিত যে কাগজটা চুল্লীতেই তিনি ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। তবে তাড়াতাড়িতে আর তার দিকে ফিবে তাকাবার সময় পান নি।

কাগজেব ছিলেটা কি তাহলে ঝাঁঝরিতে লেগে ঠিকরে পড়েছিল!

—কাগজটা আমি দেখেছি।—ঠিক তেমনিভাবেই বলে চলে হান্না।—আপনারই একটা হিসেব-নিকেশ, পাঠিয়েছেন লণ্ডনের জেমস্ লুইস নামে কোন ভদ্রলোক। কাগজটা পাকিয়ে তাতে যখন আগুন ধরিয়েছিলেন, এই নামের দিকটাই ছিল আপনার আঙুলের মধ্যে। হিসেবের সঙ্গে বাকি অংশটুকু পুড়ে গেছে।

—বাঃ।—রেণরের গলার স্বর যেন বসে গেছে।—ভারী মজার ত'। তারপর!

রেণরের কোন মন্তব্যই যেন হান্না শুনতে পায়নি।

—ঐ কাগজের ছিলে দিয়েই আপনি আপনার পিসির পোশাকে আগুন লাগিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছেন। আর তা করেছেন আমি

নেমে আসার পর পরই। আগেই বলেছি, চুল্লীতে না ছিল জ্বলন্ত কয়লা, না অঙ্গার। ঐ কাগজ ধরিয়ে, আপনি, হ্যাঁ আপনিই তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছেন।

—তাই নাকি?—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন রেণর।—তা ভালমানুষের মেয়ে, তা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরির জন্যে দরখাস্ত করছ না কেন।—ক্রমশ মেজাজ যেন চড়ে উঠতে থাকে রেণরের।—তা এইসব অভিযোগ তুলে কি বলতে চাইছ, তুমি?

—আমি হাজার পাউণ্ড চাই।—পরিষ্কার দাবি হান্নার।

রেণরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরল।

—আচ্ছা! বাঃ...। ব্ল্যাকমেল...ঘুষ!

—আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন।—তেমনিভাবেই বলল হান্না।—এক হাজার পাউণ্ড আমার চাই।

—পাবে না।—চিৎকার করে ওঠেন রেণর।—আধ পয়সা পাবে না। যাও...বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। শয়তানী... শুনতে পাচ্ছ, কি বললাম।

—পাচ্ছি।—বলল হান্না।—বেরিয়েই যাচ্ছি। তবে যাব পুলিশের কাছে।

মুখ ফিরিয়ে নিল হান্না দরজার দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টি রেণরের। মুখ চোখ যেন রাগে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল।

—দাঁড়াও।

মুখ ঘুরিয়ে আবার দাঁড়াল হান্না।—বলুন।

—তুমি তাহলে ঐ কাগজের টুকরো নিয়ে পুলিশে যাচ্ছ? আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনতে?

—হ্যাঁ।

তদন্তের সময় এই অভিযোগ আননি কেন, যদি জিজ্ঞেস করে, কি বলবে?

—বলব, তখন মনস্থ করতে পারিনি। এখন মনস্থ করেছি সব ঘটনা জানানো দরকার।

—কি ঘটনা ?

—আগুন-চুল্লী আমি ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গিয়েছিলাম। তখন সেখানে আর কিছু ছিল না। কিছু পরে সেখান থেকেই পেলাম এক পোড়া কাগজের টুকরো।—একটা হিসেব। জানাব, আপনিই ছিলেন বার্থার একমাত্র উত্তরাধিকার। জানাব, হিসেবটা জেমস লুইস নামে এক সুদী ব্যবসায়ী পাঠিয়েছিল আপনাকে।

—সুদী-ব্যবসায়ী!—চমকে ওঠেন রেণর।—কেমন করে তা জানলে তুমি ?

—কেন ? রসিদের মাথাতেই তো লেখা আছে। ঠিক তার নামের নীচে লেখা আছে 'ধার আমানত রেখে বা আমানত না রেখে'। বোঝা খুবই সহজ যে ভদ্রলোক টাকা ধার দেন। আপনার কাছ থেকে তিনি কত পাবেন, বলতে পারব না ; কারণ ঐদিকটাই পুড়ে গেছে। তবেপুলিশেরপক্ষে এটাজানা মোটেই অসাধ্য হবে না।

ভিতরে ভিতরে খুবই আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন এবার রেণর। খুব খাঁটি কথা। হান্না যদি এসব কথা পুলিশকে বলে, পুলিশের কোন কিছুই জানতে বাকি থাকবে না। ঠিক জানতে পারবে যে তিন হাজার পাউণ্ডের দেনা ছিল। আর তা আদায় দেবার জন্যে তাঁর ওপর খুব চাপ সৃষ্টি করেছিল জেমস্। সঙ্গে সঙ্গে পিসির মৃত্যু রহস্যও তাদের কাছে ফাঁস হয়ে যাবে।

সরাসরি রেণর তাকালেন হান্নার দিকে।

—টুকরো কাগজটা কোথায় ?—চাঁচাছোলা দাবি রেণরের।

—আছে। নিরাপদ জায়গাতেই রাখা আছে।

মাথায় যেন মুহূর্তে আগুন জ্বলে গেল রেণরের। তবু নিজেকে সামলে নিলেন কোনরকমে।

—শোন।—খরখর করে উঠলেন রেণর। হ্যাঁ, জেমস লুইস আমার কাছে টাকা পাবে, ঠিক, আমি স্বীকার করছি। তবে তার সঙ্গে আমার পিসির অপমৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। এ ব্যাপারে তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে। তবুও বুঝতে পারছি না, কিভাবে আমাকে এই বিপাকে পড়তে হচ্ছে। তুমি যে বেশ ধুরন্ধর, চতুর, শয়তান তা বেশ বুঝতে পারছি। ঘটনা যেভাবে সাজিয়েছ, তাতে, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অবশ্য ঐরকমই। এক্ষেত্রে, হয় তোমার মুখ বন্ধ করতে হয়, নয়তো, দুর্নামের ভাগী হতে হয়। তাতে আমারই ক্ষতি। না, আমি আমার ক্ষতি করতে সুনাম নষ্ট করতে চাই না সুতরাং, তোমার মুখ আমাকে বন্ধ করতেই হয়। কত টাকা চাও তুমি?

—বলেছি ত', এক হাজার পাউণ্ড।

—কিন্তু, এখানেই শেষ হবে না।—বললেন রেণর।

হান্না একটি কথাও বলল না।

ইচ্ছে হল রেণরের, এই মুহূর্তে ওর টুঁটিটা টিপে ধরে। শ্বাসরোধ করে খতম করে দেয় ওকে। কিন্তু কোনরকমে সামলে নিলেন নিজেকে।

—কাল সকালে বলব। ঠিক আছে? বললেন রেণর।

—কেন?

—একটু ভেবে দেখি।

চোখ কুঁচকে হান্না একবার তাকাল রেণরের দিকে।

—পালাবার মতলব, না কি?

—পালাব?—আবার মাথার মধ্যেকার উত্তাপ সামলে নিন রেণর।—পালাব কেন? কোন ভয়ে পালাব?

—পালালেও, বেশী দূর অবশ্য যেতে পারবেন না।—বলে হান্না।
—ঠিক আছে, কাল সকাল পর্যন্তই সময় দিলাম। কিন্তু সাবধান, আমার দাবি স্বীকার করে না নিলে, বা অন্য কিছু করার চেষ্টা

করলে, ফল কিন্তু ভাল হবে না, বলে যাচ্ছি।

—অন্য কিছু করা মানে?—যেন বন্য হয়ে ওঠেন রেণর।—বেরিয়ে যা,···বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে···শয়তান।

একটি কথা আর না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল হান্না মোফাত ঘর থেকে। পিছন দিক থেকে ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজা। ঠোঁটের কোলে জয়ের মৃদু হাসি।

রেণর মুখ ঘুরিয়ে তাক থেকে এক পাত্র মদ ঢেলে নিলেন গ্লাসে। হাতে মদের গ্লাস। তাকে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই, তাঁর নজর গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর পাণ্ডুলিপিতে।

গলায় পাত্রটা খালি করে তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন রেণর। সেই কাগজটা তুলে ধরলেন চোখের ওপর, যেটার ওপর লিখতে লিখতে হান্নার ঢোকার শব্দে হঠাৎ থেমে যাওয়া কলম থেকে কালি ছিটকে পড়েছিল। কী লিখছিলেন তিনি?

দেখলেন, লেখা রয়েছে:

—হঠাৎ দরজায় ধাক্কার শব্দ। খুলে গেল দরজা, ভিতরে ঢুকল বাড়ির পরিচারিকা।

—আপনার লেখার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না।—খ্যাসখেসে গলায় বলল মহিলাটি।—আমার গোটাকয় কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আশ্চর্য! রীতিমত বিস্মিত হলেন রেণর। যে কথাগুলি ক'সেকেণ্ড আগে তিনি লিখেছেন, ঠিক সেই কথাগুলিই তাঁকে শোনাল তাঁরই পরিচারিকা হান্না; মাত্র ক'সেকেণ্ড পরেই! বলতে গেলে, রেণব নিজের ঘটনা আগে থেকে নিজেই বলেছেন।

যদিও কাহিনীতে রেণর অন্য নাম, অন্য চরিত্র, অন্য বাড়ি—সবকিছুই অন্যভাবে লিখতে গেছেন, তবুও সবটাই ক্রম ম্যানরে ঘটে যাওয়া তাঁরই জীবনকে কেন্দ্র করে। তাঁরই চিন্তা, ভাবনা, কাজ যেন হুবহু লিখে গেছেন। আর লিখেছেন ঘটনা ঘটবার আগেই।

এই মহল কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে যেন লিখিয়ে নিয়েছেন। এগিয়ে নিয়ে গেছে ক্রমশ দুর্দৈবের দিকে।

রেণর এসব অনুভব করেও চেষ্টা করেন নি অন্য কিছুর। সব সময়েই তাঁর কিন্তু মনে হয়েছে, তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েই লিখছেন।

না হলে ঘটনা ঘটার আগেই তিনি কিভাবে লিখলেন দরজা ঠেলে হঠাৎ এইভাবে পরিচারিকার আগমন কথা। হান্না মোফাত যদি ঠিক ঐ সময় ঐভাবে এসে তার বিঘ্ন না ঘটাত, তাহলে তিনি কি তাঁর নায়ক ক্লড রয়সটনকে তার পরিচারিকার ঘুষের দাবির ফাঁদে ফেলতেন ?

জানতেন না রেণর। নায়কের পরিচারিকাকে নিয়ে সেই মুহূর্তে কি করতেন তিনি, তখনও পর্যন্ত ঠিক ছিল না তাঁর। এমন কি সেই সময় পর্যন্ত তিনি জানতেন না, ঐ অবস্থায় পরিচারিকাকে তিনি খাবার ঘরে কেনই বা আনলেন।

আচ্ছা, বিনা বাধায় তিনি যদি লিখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর নায়ক রয়স্‌টন কি তাঁরই মত মুখোমুখি হত এমনি এক সমস্যার, আর যেভাবে তিনি নিজে এর মোকাবিলা করলেন, সে-ও কী এইভাবেই তার মোকাবিলা করত ?

কেমন যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করতে সুরু করলেন রেণর।

চকিতে টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে নিলেন রেণর। সুরু করে দিলেন লিখতে। প্রথমে ধীর, তারপর অতি দ্রুত।

এক ঘণ্টা....আরও এক ঘণ্টা—আবার সেই নিস্তব্ধ ঘরে কাগজের বুকে দ্রুত খসখস আওয়াজ। বিরামহীন কলমের গতি। জমা হচ্ছে পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপি। দেখতে দেখতে প্রায় মধ্যরাত। কমতে কমতে প্রায় নিবু নিবু আগুন-চুল্লী।

অবশেষে থামলেন রেণর। দেওয়ালের রূপোলী ঘড়িতে রুণু-ঝুনু করে বাজল তিনটে। হাত থেকে কলম নামিয়ে রাখলেন রেণর।

টেবিলের ওপর তাঁর পরিষ্কার, ঝরঝরে লেখা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা-গুলোর পাতা মিলিয়ে একত্র করলেন।

তারপর চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে, পড়ে গেলেন একের পর এক পৃষ্ঠা। পড়তে পড়তে একটু মৃদু হাসিব উল্লাস ফুটে উঠল রেণরের ঠোঁটে।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে রেণবের। তাঁব নায়ক ক্লড বয়স্‌টন যেভাবে তার পরিচারিকার মোকাবিলা করল কাহীনীর মধ্যে, ঠিক সেইভাবে তিনিও....।

॥ সাত ॥

পরদিন সকাল নটা। রেণর ডাইনিং রুমে বসেই প্রাতরাশ সমাধা করলেন। প্রাতরাশ শেষ হওয়ার পর তাঁব প্রথম কাজ হল নিজের সিগারেটের বাক্স থেকে একমুঠো সিগারেট নিয়ে চুল্লীর আগুনে ফেলে দেওয়া। ফেলে দিয়ে টেনে নিলেন খবরের কাগজ। ততক্ষণ চোখ বুলিয়ে গেলেন সংবাদে, যতক্ষণ পর্যন্ত সিগারেটগুলো আগুনে পুড়ে ছাই না হয়ে গেল। মনের কোথাও কোন উত্তেজনার বিন্দুমাত্র নেই। একেবারে ধীর, শান্ত।

এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি সোজা চলে গেলেন রান্নাঘরে। হান্না মোফাত আর ডায়না ছিল সেখানে। হান্না ঘর পরিষ্কার করছিল আর বাসন-কোসন পরিষ্কার করছিল ডায়না।

—এ বাড়ির জানালাগুলো কে পরিষ্কার করে।—জানতে চাইলেন রেণর।

হঠাৎ এমন একটা প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল হান্না। কপাল কুঁচকে তাকাল একবার রেণরের দিকে। তারপর দিল ছোট্ট জবাব—আমরাই করি।

—তাহ'লে, ঐ কাজটা আগে কর। এখনই। বললেন রেণর।
—বড্ড অপরিষ্কার হয়ে আছে।

একটা রূঢ় জবাব প্রায় ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল হান্নার। কোনরকমে সামনে নিল নিজেকে।

—ঠিক আছে, হবে।—গোমড়া মুখে বলল হান্না।

এবার রেণর তাকালেন মেয়েটির দিকে।

—শোন, তোমার সঙ্গে দরকার আছে। ডাইনিং রুমে এসো।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে রেণর চলে এলেন খাবার ঘরে। দাঁড়ালেন আগুনকে পিছনে রেখে। কয়েক মিনিট পর মেয়েটি এল। একমুহূর্ত ভেবে নিলেন রেণর, মেয়েটিকে আলাদা ডাকায় হান্নার নিশ্চয়ই কৌতূহল হয়েছে ব্যাপার কি জানার জন্যে। এখানে আসার আগে দুজনের মধ্যে কোন কথা হয়েছে কি ?

মেয়েটি আসতেই এক পলকে রেণর দেখে নিলেন পোশাক বদলেই এসেছে ডায়না।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি—বলুন।

দরজা বন্ধ করে দাও।—রেণর আদেশের সুরে বললেন।

বন্ধ করে দিল দরজা ডায়না।

—ছাখ ডায়না,—বেশ মোলায়েম স্বর রেণরের।—একটাও সিগারেট নেই। আমার নতুন বইটা লিখতে লিখতে প্রায় সকাল হয়ে গেল। যেকটা সিগারেট ছিল, সব শেষ করে ফেলেছি। তুমি একবার ফায়ারফিল্ডে গিয়ে আমার জন্যে এক বাক্স সিগারেট এনে দেবে ?

—নিশ্চয়ই দেব।—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মেয়েটি।

—এখনই যাবে ?—জিজ্ঞেস করলেন রেণর।—আমি এখনই আবার লিখতে বসতে চাই। কিন্তু সিগারেটের জন্যে দম ফেটে যাচ্ছে। ছাখ, ঐ-টার্ন থেকে যদি আন, ও আমার চলবে না। তোমাকে ফায়ারফিল্ডে যেতে হবে। তোমার সাইকেল আছে ত'? তাই না ?

—হ্যাঁ। আছে।—বলল ডায়না।—ওখান থেকেই এখনি আপনাকে এনে দেবো। কি সিগারেট, বলুন।

রেণর তাকে বলে দিলেন। ডাইনিং রুমের জানালা থেকে তার পনের মিনিট বাদে দেখলেন, মেয়েটি সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। মনে মনে হিসেব করাই ছিল রেণরের, ফায়ারফিল্ড যেতে আর আসতে ওর পুরো এক ঘণ্টা লাগবে।

সকালের বসার ঘরে, যেটাকে নিজে লেখাপড়ার ঘর করার ইচ্ছে ছিল রেণরের। সেই ঘরে একবার ঢুকে আবার রেণর ফিরে এলেন ডাইনিং রুমে—হাতে বেলনাকার মজবুত একটা আবলুস-কাঠের ডাণ্ডা। দরজাটা বন্ধ করে ডাণ্ডাটা মুঠোয় ধরে ভালভাবে একবার পরখ করে নিয়ে, আগুন-চুল্লীর পাশে গিয়ে, সেই পুরাতন কলিং বেলটা বাজালেন।

রান্নাঘরে ঘণ্টার শেষ শব্দটুকু মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রেণর দ্রুত দরজার পাশে দাঁড়ালেন। হাতে সেই ডাণ্ডা।

উত্তেজনায় তালু শুকিয়ে গেছে, বুকের ভিতরে হাতুড়ির শব্দ; শুনতে পেলেন বারান্দায় হান্না মোফাতের পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হাতল ঘুরে গেল। দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতরে ঢুকল হান্না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন রেণর তার ওপর। মাথা লক্ষ্য করে সজোরে বসিয়ে দিলেন ডাণ্ডাটা। রেণরের গায়ে যত শক্তি ছিল, সব শক্তি নিয়ে ডাণ্ডা হান্না মোফাতের মাথা গুঁড়িয়ে চুরচুর করে দিল। সামান্য এক গোঙানি। প্রায় দলা পাকিয়ে কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ল হান্নার নিষ্প্রাণ শরীরটা।

সবকিছু একেবারে ছকে বাঁধা। প্রাতঃরাশের পর থেকে রেণরের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা একেবারে পরিকল্পনা-মাফিক—তাঁর কাহিনীর নায়ক ক্লড রয়স্টন তার পরিচারিকার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে পরিকল্পনা করেছিল, রেণর তার থেকে একচুলও

এদিক-ওদিক করেন নি।

হান্নার দলা-পাকানো শরীরটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন রেণর। তারপর, কোনরকমে তাকে বগলদাবা করে ঘর থেকে হলঘর পেরিয়ে তুলতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে।

একে ভারী মহিলা, তার ওপর মরার ভার। হাত টনটন করতে লাগল রেণরের, প্রায় হাফিয়ে যাবার উপক্রম। তবুও কোন-রকমে তাকে টেনে তুললেন তে-তলায়। নিয়ে গেলেন একেবারে সিঁড়ির মাথার কাছেই শোবার ঘরে।

মেঝের ওপর তাকে নামিয়ে রেখেই ক্রুস্পায়ে এলেন নিজের শোবার ঘরে। জ্যাকেটটা খুলে রাখলেন। হাতে একজোড়া দস্তানা এঁটে ছুটলেন রান্নাঘরে।

আধ-বালতি গরম জল নিয়ে একটুকরো সাবান ফেলে দিলেন তাতে। তারপর খুঁজতে সুরু করলেন বুরুশ। রান্নাঘরেবই এককোণে দেখতে পেলেন একটা ঝোলান রয়েছে।

জলের বালতি আর বুরুশ নিয়ে চকিতে উঠে এলেন ওপরের সেই ঘরে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন হান্না মোফাতকে।

ঠিক যেমনভাবে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন তিনি. এসে দেখলেন ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে। রেণরের দৃঢ় বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই মরে গেছে। ডাণ্ডা দিয়ে সেই প্রচণ্ড আঘাতই তিনি তাকে হেনেছেন, যেমনটি হেনেছিল তাঁর কাহিনীর ক্লড রয়স্টন।

ক্লড-ও তার পরিচারিকাকে ঐভাবেই ঘরের মেঝেয় ফেলে রেখে গিয়েছিল। জানতও না। ডাইনিটা আদপেই একেবারে মরে গেছে কিনা। কারণ, তাড়াতাড়িতে তখন আর কিছু খুঁটিয়ে দেখবার সময় ছিল না।

ক্লডের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত তখন ছিল যেমন মূল্যবান, তার স্রষ্টা রেণরের কাছেও প্রতিটি মুহূর্ত এখন তাই।

এবার যথারীতি ক্লডকেই পর পর অনুসরণ করে চললেন রেণর।

শোবার ঘরের বন্ধ জানলাটা খুলে একবার বাইরেটা দেখলেন।

জানালার ঠিক নীচেই একটা বাঁধানো চাতাল। তার পরেই বাগান; বনবীথি, মহলের পিছনে সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে ফাঁকা মাঠের দিকে।

কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই; নেই কোথাও কোন শব্দ। শান্ত হেমন্তের সকাল।

জানালা বন্ধ করে রেণর দ্রুত নিজের কাজে লেগে পড়লেন। বালতিতে বুরুশটা ভিজিয়ে নিয়ে জানালার ভিতরটা পরিষ্কার করে ফেললেন। তাড়াতাড়ি থাকা সত্ত্বেও বেশ যত্ন নিয়েই তিনি পরিষ্কার করলেন, যেমনটি হান্না মোফাতের মত মহিলার পক্ষেই করা সম্ভব।

তারপর আবার জানালাটা খুলে, আর একবার চারদিক ভাল-ভাবে চোখ বুলিয়ে নিলেন। নিশ্চিন্ত কেউ কোথাও নেই। পা-ছুটো ঘরের ভিতরে রেখে তিনি বসলেন জানালার গোবরাটে। আর খুব তাড়াতাড়ি জানালার বাইরের দিকের নীচটুকু পরিষ্কার করে ফেললেন।

শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার নেমে এলেন ঘরে। মেঝের ওপব বালতির পাশে ভিজে বুরুশটা রাখলেন। তারপর ঝুঁকে হান্না মোফাতের অসার দেহটা তুলে টানতে-টানতে নিয়ে এলেন খোলা জানালার কাছে। আর একবার নীচের চাতালের ওপর বুলিয়ে নিলেন সজাগ দৃষ্টি। ভালভাবে নিরীক্ষণ করে নিলেন চাতালের আশ-পাশ।

না, কেউ কোথাও নেই। জানালার গোবরাটে ঠেস দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে টেনে ওপরে তুলে, কোন রকমে নিজের বগলে চেপে ধরলেন। তারপর, প্রথমে একটা হাত, পরে অপর হাতটা তুলে তার আঙুলগুলো চেপে-চেপে ধরলেন জানালার কাচে।

—যথেষ্ট আঙুলের ছাপ পড়েছে।—প্রায় হাঁফিয়ে উঠেছেন রেণর।

তারপর মহিলাটির কাঁধ গোবরাটে ঠেকিয়ে মাথাটা বাইরের দিকে ঝুঁকে দিয়ে শক্ত হাতে ধবলেন তার কোমরটা। তারপর চকিতে সামনেরদিকে ঠেলে দিয়ে পায়েব গোড়ালি চেপে মহিলাটিকে চাতাল বরাবর ঝুলিয়ে ধরলেন।

মুহূর্ত মাত্র। তাবপবই ছেড়ে দিলেন। ওপরে রেণরের কানে এসে বাজল তার পতনের ধপ্ শব্দ। ঠিক সেই সময় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখার সাহস হল না রেণবের। তারপব নিজেকে ঠিক করে নিয়ে ঝুঁকি দিলেন নীচেয়। দেখলেন গোল-গোল পাকিয়ে পড়ে আছে পরিচারিকা হান্না মোফাত, যে তাকে ভয় দেখিয়ে চেয়েছিল টাকা আদায় করতে।

যাক, এবার নিশ্চিন্ত রেণর। ডাণ্ডার আঘাতে যদি আগে মরেও না থাকে, এখন.... ।—এখন আব কোন সন্দেহ নেই। ভয় দেখিয়ে হাজার পাউণ্ডের দাবি? এবার···উপযুক্ত জবাবই দেওয়া হয়েছে।

এরপর ঘরের ভিতব থেকে তুলে নিলেন ভিজে বুরুশটা। আবার জানালায় ঝুঁকে সেটিও ছুঁড়ে দিলেন নীচেয়। পড়লো এসে মহিলার একটু তফাতে।

আবার মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন ঘরের দিকে। চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন একবার—কোন ভুল কোথাও থেকে গেল কি না। নাঃ। সব ঠিক ঠিক হয়েছে। একেবারে ক্লডের পরিকল্পনা-মাফিক নিখুঁত।

দারুণ···দারুণ হয়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খুঁটিয়ে হয়ে গেল সব কাজ। যত তাড়াতাড়িই করুক, ফায়ারফিল্ড থেকে মেয়েটা এগারোটার আগে কোনমতেই ফিরতে পারবে না। আর, যদি নিজের কিছু কেনা-কাটা থাকে, অস্বাভাবিক নয়, তাহলে আরও দেরী হবে ফিরতে।

রেণর যখন এমনি চিন্তায় মগ্ন, বাড়ির বাইরের পুরোণো বেলটা বেজে উঠল।

—এখন, এই সময় আবার কে এল ?—চমকে ওঠেন রেণর।

নিজেকে সংযত করে, গলার টাই-টা ঠিক করে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলেন রেণর। তারপর ঘর ছেড়ে গাম্ভীর্য নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন দরজা।

আগন্তুক এক বেঁটে-খাটো শক্ত-সামর্থ ভদ্রলোক আর একটি মেয়ে। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ তামাটে ; নীল চোখ আর একমুখ সাদা দাড়ি। পরিচ্ছন্ন পোশাক, হাতে ছড়ি। টুইডের পোশাক-পরণে মেয়েটি কিন্তু, দারুণ সুন্দরী। যেমন তার দেহের গড়ন, তেমনি তার মুখ চোখ।

—আপনিই মি রেণর ?—জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

হ্যাঁ।—বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই জানালেন রেণর।

—আমি কর্নেল ব্ল্যাকনে।—বলতে বলতে নিজের পরিচিত কার্ডটি তুলে দিলেন রেণরের হাতে।—আপনারই প্রতিবেশী। থাকি এই হলারটন হল-এ। এটি আমার মেয়ে এডিথ। শুনলাম, আপনি এই মহলটা নিয়েছেন। ভাবছিলাম, এসে আলাপ করব। তাই এসে পড়লাম।

—এ ত' খুব ভাল কথা।—হাসিমুখে বললেন রেণর।—আমার সৌভাগ্য যে আপনারা এসেছেন। তা, ভিতরে আসুন।

—না···না। এখন আপনাকে বিরক্ত করব না। আপত্তি জানালেন কর্নেল।—শুধু কার্ডটা রেখে যাব মনে করেই এলাম। প্রতিবেশীর কর্তব্য, বুঝলেন না। কারোর সঙ্গে কারোর পরিচয় না থাকলে, বড় ফাঁকা লাগে···দারুণ ফাঁকা জায়গা। একদিন সান্ধ্যভোজে আসুন না। খুব খুশী হব।

—অশেষ ধন্যবাদ। আমার এসব খুব ভাল লাগে।—বললেন রেণর।—ভিতরে আসুন···আমার কোন অসুবিধে হবে না।

—বলছেন যখন, ঠিক আছে।—চলুন। এডিথ এস।

ভিতরে ঢুকে সদর দরজা আবার বন্ধ করে রেণর তাঁদের নিয়ে

এলেন ডাইনিং রুমে।

—বাইবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে কোন অপরাধ নেবেন না। —বললেন রেণর।—বাড়িতে আমার মানুষজন মাত্র দুজন, এক মহিলা আর তার ভাইঝি। মেয়েটি বাইরে গেছে। মহিলাটি বোধ হয় ওপরে কোন কাজে ব্যস্ত। কীভাবে যে আপনাদের আপ্যায়ন করি? একটু পানীয় দিই কেমন?

ভদ্রলোক নিলেন একপাত্র সোডা মিশিয়ে হুইস্কি আর মেয়েটি সেরি।

সুস্বাস্থ্য কামনা করে, কর্নেল বললেন—আপনি ত' একজন লেখক মানুষ। তাই না?

—ঐ একটু-আধটু।—বিনয়ের সঙ্গে জানালেন রেণর।

—আমি কিন্তু আপনার সব বই-ই পড়েছি।—বলল এডিথ।

রেণর তাকালেন তার দিকে। মৃদু হাসলেন।

—হ্যাঁ…হ্যাঁ, মেয়ে আমার আপনার সব বই পড়েছে।—বললেন কর্নেল।—যখন থেকেই ও শুনেছে আপনি এখানে আসছেন, তখন থেকেই লাইব্রেরিতে যতগুলো আপনার বই ছিল, সবকটি এনে শেষ করেছে। আমি মশাই, আবার ও-রসে বঞ্চিত। আমিও পড়েছি —তবে খেলার পত্র-পত্রিকা আর কিছু জীবনী। আগেই আপনার কাছে এসে আলাপ জমাতাম। শুনলাম আপনার পিসির দুর্ঘটনার কথা। বড় মর্মান্তিক। মন-টন খুব ভেঙ্গে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।—বেশ নীচু গলায় জবাব দিলেন রেণর।

—শিকারে গেছেন কখনো?—প্রসঙ্গান্তরে গেলেন কর্নেল।—ইচ্ছে হলে যে কোন সময় আমার সঙ্গে যেতে পারেন। খুব ভাল শিকারের জায়গা। সপ্তাহে তিন দিন বাঁধা। কখনও বেশী হয়ে যায়। এডিথও যায়। ভাল শিকারী। আমাকেও ছাড়িয়ে যায়।

—এখানে থিতু হবার পর মাঝে-মধ্যে যেতে পারি।—বললেন

রেণর।—সত্যি কথা বলতে কি, আমিও এইরকম সঙ্গীই··

রেণরের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে ভেসে এল এক ভয়ার্ত আর্ত্তনাদ।

মিস্টার···মিস্টার আপনি কোথায়। হান্না জানলা থেকে নীচে পড়ে গেছে।

—অ্যাঁ। সে আবার কি?—কর্নেল এমনভাবে চমকে উঠলেন যে হাতের পাত্র থেকে মদই চলকে পড়ে গেল।

ব্যাপারটা রেণরের অজানা নয়। গাঁয়ের একটা ছেলে দেখতে পেয়েছে তাকে। বুট-পরা পায়ে হলঘরে বারান্দায় ছুটে আসছে তার শব্দ, ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর:

—মিস্টার···মিস্টার···শীগ্‌গির আসুন। হান্না বুড়ি মরে গেছে.... চাতালে পড়ে আছে।

রেণর উঠে চকিতে ডাইনিং রুমের দরজা খুলতেই দেখলেন, হলঘরে দাঁড়িয়ে একটা গেঁয়ো-ছেলে, গলায় ফাঁস-লাগানো একটা লাল মাফলার। মুখ তার ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে যেন চোখ দুটো। রেণরকে দেখতে পেয়েই আবার সে বলে উঠল!

—মাস্টার হান্না বুড়ি মারা গেছে। ঐ চাতালে পড়ে গেছে জানালা থেকে। পাশে বুরুশটাও।

শুনে রেণর কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে হলঘর পেরিয়ে বান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এলেন চাতালে। পিছনে-পিছনে হতবাক কর্নেল।

চাতালে পড়ে হান্না মোফাত-দুমড়ে-মুচড়ে, যেন তালগোল পাকানো। সজোরে মাথাটা এসে প্রথমে লেগেছে চাতালে। গুরুতর আঘাত। মারা গেছে নিশ্চিত। একটু তফাতে দুর্ঘটনার নীরব সাক্ষী—সেই ভিজে বুরুশ।

সর্বনাশ!—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কর্নেল আর রেণর দেখলেন

হান্নাকে। দেখলেন, সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে সে।—কীভাবে ঘটল এমন দুর্ঘটনা?

রেণর কয়েক পা পিছিয়ে, তাকাল ওপরে জানালার দিকে। ঠিক মাথার ওপরই তেতলার একটা জানালা খোলা। নিজেই খুলেছিলেন।

—দেখে ত' মনে হচ্ছে, বোধ হয় ঐখান থেকেই পড়েছে।—রেণরের কণ্ঠে বিষাদ।

কর্নেলও রেণরের সঙ্গে তাকালেন ওপর দিকে।

—ঠিক বলেছেন।—একমত কর্নেল।—হ্যাঁ, ঐখান থেকেই··· টাল সামলাতে পারেনি। আচ্ছা বোকা ত'? জানালার বাইরে গোবরাটে বসে কেউ বাইরেটা পরিষ্কার করার ঝুঁকি নেয়! আমার বাড়িতে ওসব চলবে না।

—আচ্ছা মহিলা ত'? দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়ে ত' বেশ ঝামেলায় ফেলে দিয়ে গেল।

—ওকথা বলবেন না।—সত্যি সত্যিই যেন মর্মাহত রেণর।—আমি ত' দেখেছি, মহিলাটি কত ধীর, স্থির।

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবতাম!—বললেন কর্নেল।—আমারও তাই ধারণা ছিল। এদিকে প্রায়ই ওকে দেখেছি। অদ্ভুত মহিলা। ভেতর-মুখো। জানি গাঁয়ের কারো সঙ্গেই মিশতো না। তবুও··· একটা মারাত্মক ঘটনা। সবদিক থেকে খুঁটিয়ে দেখাই ভাল। ফায়ারফিল্ডের স্থানীয় প্রশাসক যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। কত তাজ্জব ব্যাপার যে ঘটতে দেখেছি।

হঠাৎ নজর পড়ল কর্নেলের তার কন্যা এডিথ আর সেই গেঁয়ো ছেলেটার দিকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে।

—এডিথ, ভিতরে যাও। আদেশের সুর কর্নেলের কণ্ঠে।—এটা মেয়েদের থাকার জায়গা নয়।

সুবোধ মেয়ের মত এডিথ চলে যেতে কর্নেল আবার

তাকালেন রেণরের দিকে।

—আপনি যেন খুব ঘাবড়ে গেছেন, বলে মনে হচ্ছে?—সহানুভূতি জানান কর্নেল।—অবশ্য স্বাভাবিক। আসুন, মহিলাকে ঢাকা দিয়ে ভিতরে গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক। তাতে খানিকটা অন্তত চাঙ্গা হওয়া যাবে। তারপর ওপর তলায় গিয়ে দেখা যাবে'খন।

—তাহলে এখানে এই মহল নিয়ে যেসব কানাঘুষা হয়। দেখছি তা মিথ্যে নয়।—হুইস্কির সঙ্গে সোডা মেশাচ্ছিলেন তখন রেণর।—বাড়িটার সঙ্গে দুর্ভাগ্য দেখছি…।

—থামান ওসব কথা।—ছেদ টেনে দিলেন রেণর।

চমকে উঠে কর্নেল তাকালেন তাঁর দিকে। হঠাৎ এমন একটা জবাবে তাঁর তামাটে মুখটা যেন একটু কালো হয়ে গেল।

—আমি দুঃখিত। এই মুহূর্তে ওকথা বলা আমার ঠিক হয়নি। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ। আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—না…না, ঠিক আছে। আমিই দুঃখিত।—হাতে ব্রাণ্ডি নিয়ে বললেন রেণর।—এই বাড়িটার ওপর নাকি কোন যাদু আছে… ভৌতিক মহল …শুনতে-শুনতে আমি ক্লান্ত। কিন্তু, আমি ত' মশাই ওসব কিছু বুঝতেই পারছি না। বাড়িটা দেখে অবধি মনে হয়েছিল, আমারই বাড়ি। তাই বেশ আগ্রহ নিয়েই এসেছি। থাকতেও চাই, নিজের মত, শান্তিতে।

—নিশ্চয়ই…একশোবার।—বললেন কর্নেল।—কিন্তু যা সব ঘটছে—জঘন্য। এই সব দেখেই মনে হয় বাড়িটা…

—বাবা।—মেয়ে এডিথ যেন সাবধান করে দিল তাঁকে।

—কি? ও…হ্যাঁ …ঠিক ঠিক।—সামলে নিলেন কর্নেল নিজেকে। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়তেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে রুমালটা আবার যথাস্থানে রেখে

বললেন রেণর—তাহলে ওপর তলাটা একবার দেখতে যাওয়ার…

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।—সম্মতি জানান রেণর।

কর্নেলকে নিয়ে রেণর চলে গেলেন তে-তলায়। এডিথ বসে রইল ডাইনিং রুমেই।

জলের বালতিটা মেঝের সেখানেই পড়ে আছে, রেণর যেখানে সেটি রেখে গিয়েছিলেন।

—এ ও' পরিষ্কার ব্যাপার।—ভালভাবে চারদিক দেখে বললেন কর্নেল, হতভাগী জানালার ভিতর দিকটা পরিষ্কার করে বাইরের দিকে যেতে গিয়েই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালেন তিনি।

—আরে, পোজার এসেছে, দেখছি।—গলা তুলে ডাকলেন কর্নেল তাকে।—পোজার ওপরে এস।

জানালায় মুখ বাড়ালেন রেণর। বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি পুলিশ ঢাকা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। পিছনের দরজার পাঁচিলে ঠেকানো তার সাইকেল।

পুলিশের লোকটি ওপরে আসতেই, কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি হলেন মি. রেণর।—তারপর বললেন,—নিজেই দেখতে পাচ্ছ, ব্যাপারটা কি ঘটেছে। জানলাটা পরিষ্কার করতে গিয়ে সামলাতে পারেনি। পড়ে গেছে।

রেণর নীরব। ভাবছেন মনে মনে, একেই বলে ভাগ্য। কোথা থেকে আজই সকালে এই ম্যাজিষ্ট্রেট ভদ্রলোক এলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এখনও পর্যন্ত যতখানি কাহিনীটা লিখেছেন রেণর, তাতে এমন পর্ব আসে নি। এরপর যখন বসবেন, আবার সেই অদৃশ্য শক্তি কাগজের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর কলম, যেমনটি করে আসছে। আর লিখে যাবে তার ভবিষ্যৎ গতি-প্রবাহ।

এবার ডায়নার চিন্তা এল রেণরের মাথায়। মনটা খিঁচড়ে

গেল। মেয়েটার সম্বন্ধে এখনও তিনি কিছুই জানেন না। কি ধরণের মেয়ে কে জানে? এ ব্যাপারে তার ও' জবানবন্দী পুলিশ চাইবেই। কী বলতে পারে সে? কি বলবে?

যাই সে বলুক, অপরাধের কোন ফাঁস তাঁর গলায় সে পরাতে পারবে না। হান্না মোফাত যে তাকে ভয় দেখিয়ে ঘুষ নিতে চেয়েছিল, কোনরকমে তা যদি ডায়না জেনেও থাকে, আর বলেও, প্রমাণ কোথায়? হান্নার মৃত্যুর সঙ্গে যে তিনি জড়িত, কোথাও তার কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ কোথাও রাখেনও নি।

॥ আট ॥

পুলিশ কনস্টেবল পোজার—হাতে নোট বই—কর্নেলের সঙ্গে এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

—দেখতে পাচ্ছ, ভিতরটা পরিষ্কার।—কর্নেল বুঝিয়ে দিতে লাগলেন পোজারকে—বাইরেটা পরিষ্কার করতে গিয়েই দুর্ঘটনা

—ঠিক স্যার।—নোট বই-এ পেন্সিল দিয়ে লিখতে লাগল পোজার। লেখা শেষ করে তাকাল রেণরের দিকে।—'ঘটনা ঘটার সময় আপনি বাড়িতে ছিলেন?

—হ্যাঁ, সকাল থেকে বাইরেই বেরোই নি।'—বললেন রেণর। —দশটা থেকে ডাইনিং রুমে বসে লিখছিলাম।

কনস্টেবল লিখে নিল।

—কতক্ষণ আগে পর্যন্ত ওকে বেঁচে থাকতে দেখেছেন?

—সাড়ে ন'টা থেকে সওয়া দশটার মধ্যেও দেখেছি।—বললেন রেণর।—রান্নাঘরে গিয়ে ওর আর ওর ভাইঝির সঙ্গে কথাও বলেছি। তখনই আমি ওকে বলেছিলাম, জানালাগুলো বড় অপরিষ্কার রয়েছে, পরিষ্কার করা দরকার।

—ও, তাহলে তারপরই ওপরে এসেছিল, পরিষ্কার করতে।—নোট বইতে লিখতে লিখতে জানতে চাইল—লিখতে লিখতে কোন চিৎকার, আর্তনাদ বা কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন ?

—না। কোন কিছুই শুনতে পাই নি।—জবাব দেন রেণর। —চাতালে পড়ে গিয়ে হান্না মোফাত যে মারা গেছে,—এত বড় একটা দুর্ঘটনা যদি ঐ গেঁয়ো ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠে না জানাত, তাহলে হয়ত এখনও জানতেও পারতাম না।

—ঠিক আছে। সার্জেণ্ট অ্যান্‌স্‌ট্রুথার আর ডাক্তার ম্যাকট্যাভিস এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।—বলল—পুলিশ কনস্টেবল।—টেলিফোন করে দিয়েছি। এসে পড়লেন বলে।—নোট বই বন্ধ করতে করতে বলে চলল সে—ইতিমধ্যে মৃতের ভাইঝির সঙ্গে একটু কথা বলা উচিত।

—বাড়িতেই কোথাও আছে।—বললেন রেণর।—নীচের বৈঠকখানা ঘরে কিংবা রান্নাঘরে ; খুঁজে দেখছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রেণর জানতেন, এই তলাতেই ডায়না এবং হান্নার শোবার ঘর। যদিও মহলে এসে অবধি কখনো দেখেন নি।

কনস্টেবল আর কর্নেল ব্ল্যাকনে নীচে চলে গেলে, রেণর পা বাড়ালেন শোবার ঘরগুলোর দিকে।

প্রথমটায় ঢুকেই বুঝতে পারলেন, এটা হান্না মোফাতের ঘর। ছোট্ট, দারুণ পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালের কোল ঘেঁসে একানে বিছানা। দরজার পাশে পোশাক ঝুলছে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রেণর খুললেন পাশের ঘরটা। একনজর দেখেই বুঝলেন, এটাই ডায়নার ঘর, যদিও মেয়েটি ঘরে নেই। খাটের হাতলে ছড়িয়ে পড়ে তার কোট।

হান্নার মতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো ঘর। বাড়তির মধ্যে দেওয়ালে একটা ছোট্ট বই-এর আলমারি।

অস্বাভাবিক কৌতূহলে রেণর ঘরে ঢুকে এগিয়ে গেলেন বই-এর

আলমারির দিকে। কৌতূহল কি ধরণের বই পড়তে ভালবাসে মেয়েটি। একটা বিষয়ে রেণরের স্থির বিশ্বাস—পড়ার বই দেখলে পাঠকের চরিত্র বোঝা যায়।

বই-এর শেল্‌ফে বেশ মোট-মোটা বই—দেখে চোখ কোঁচকালেন রেণর। দেখলেন, বেশ সব দুষ্প্রাপ্য বই। ভেবে অবাক হলেন, একটা কুড়ি বছরের মেয়ে এই সব বই পড়ে! স্কারন্‌হস্টের সুবিখ্যাত বই 'অপরাধ বিশ্লেষণ', ওর্মের সেই মহামূল্যবান গ্রন্থ 'আত্মার নিগ্রহ', পিডোস্কির 'পশুর পশুধর্ম', ফ্রেজারের পঞ্চদশ শতকের 'ডাকিনী পূজা···আশ্চর্য!

এছাড়াও এই ধরণের আরও বেশ কিছু বই, যার নাম রেণর কখনো শোনেন নি। নিঃসন্দেহে এ একটা সম্পদ।

এই সব কোথা থেকে সংগ্রহ করল মেয়েটি! পড়ে নিশ্চয়ই, না হলে শোবার ঘরেই বা থাকবে কেন?

এই মহলে আসার প্রথম রাতে আয়নায় ডায়নার সেই মুখের ক্ষণিক প্রতিচ্ছবি রেণবের চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, চমকে উঠলেন একবার। এখন যেন অনুমান করতে পারছেন, সেই মুখের রহস্য।

তখন মনে হয়েছিল মেয়েটি শয়তান, কিন্তু তেমন আমল দেন নি। এখন পরিষ্কার—মনে শয়তানী না থাকলে এইসব বই থেকে কী রস আস্বাদ করা যায়!

মেয়েটির সম্বন্ধে এতদিন যে কৌতূহল তাঁর জাগেনি, এবার তা বেশ উদগ্র হয়ে উঠল। মনস্থ করলেন, এ নিয়ে তিনি মেয়েটির সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করবেন, হান্না মোফাত আর নেই। সুতরাং সুযোগের অভাব হবে না।

হান্নার নাম মনে আসতেই এক ধাক্কায় রেণর বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। এতক্ষণ যেন ওদিকে কোন হুঁসই ছিল না। নীচেয় যাওয়ার দরকার। মনে হতেই ঘর ছেড়ে দ্রুত পায়ে এলেন

রান্নাঘরে। দেখলেন, রান্নাঘরের টেবিল ধরে একা দাঁড়িয়ে ডায়না। দেখলেন। আর সেই এক ঝলক দেখাতেই বুঝতে পারলেন, মেয়েটি মোটেই বিভ্রান্ত নয়।

—ওঁরা সবাই বাইরে চাতালে গেছেন।—নিরুদ্বেগ ডায়না। —পুলিশের সঙ্গে সার্জেন্ট অ্যান্‌স্ট্রথার, ডাঃ ম্যাকটাভিস, কর্নেল ব্ল্যাকনে-ও গেছেন।

রেণর আর একবার খুঁটিয়ে দেখলেন তাকে। মুখের কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

—পোজার তোমার জবানবন্দী নিশ্চয়ই নিয়েছে।—বললেন তিনি।—দিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

ধক্ করে উঠল রেণরের বুক।

—কি বললে ?—নিজেকে কোনরকমে সামলে রেখে জিজ্ঞেস করলেন রেণর।

—আমি যেটুকু জেনেছি।—ছোট্ট জবাব মেয়েটির।

কী জেনেছে ? কতটুকু জেনেছে জানার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ ছটফটানি অনুভব করলেন রেণর সেই মুহূর্তে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সংযত করে নিলেন নিজেকে। আগ্রহ দেখানো ঠিক হবে না। ও কতটুকু জেনেছে, একটুও যদি জানতে পারতেন রেণর তাহলে নিজের সম্বন্ধে খানিকটা সজাগ হতে পারতেন। কিন্তু জানেন না, জানার সাহসও পেলেন না।

কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে থাকলেন সেখানে। যদি মেয়েটি আবার মুখ খোলে। অন্তত, পুলিশের কাছে কি বলেছে, সেটুকুও যদি বলে। কিন্তু না। টেবিলের কাছ থেকে চুল্লীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুধু বললে—ডাইনিং রুমে আপনার সিগারেট রেখে এসেছি।

রেণর বুঝতে পারলেন, কোন সম্ভাবনা নেই। মনে মনে খুবই

ক্ষেপে উঠলেন তার ওপর। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন চাতালে।

মনে মনে বললেন—ওখানে গেলেই বুঝতে পারা যাবে। জবানবন্দীতে যদি তেমন কিছু বলে থাকে, তাহলে, ওদের মধ্যে একটু সন্দেহের আভাষ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

॥ নয় ॥

রেণরকে আপ্যায়নের মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ পেল না, যা তার মনে অযথা কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ডাঃ ম্যাক্‌টাভিস তাঁকে দেখামাত্রই বন্ধুত্বসূচক ঘাড় নাড়লেন, কর্নেল ব্ল্যাকনে সার্জেণ্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—এই যে ইনিই হলেন মি. রেণর। আর মি. রেণর, ইনি সার্জেণ্ট অ্যান্‌সট্রুথার।

রেণর দেখেই বুঝলেন এ-লাইনে বেশ ঝানু।

—কেমন আছেন?—জিজ্ঞেস করেন সার্জেণ্ট।

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফিরে তাকালেন ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার ইতিমধ্যে মৃতদেহটা সোজা করে ফেলেছিলেন।

—হ্যাঁ, জানালা থেকেই পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। —বললেন ডাক্তার।—মাথার খুলি, ঘাড় ভেঙ্গে গেছে। ডান হাতের বেশ কয়েকটা হাড়ও গেছে। ওপর থেকে পড়ার ফলে ভিতরটাও বেশ জখম হয়েছে। একে আপনি ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন।

ডাক্তার তাঁর টুপি তুলে নিলেন। বললেন—আমার দেখা হয়ে গেছে।

—আগামী কাল একসময় তদন্ত হবে'খন।—বললেন সার্জেন্ট। —কখন হবে আমি জানিয়ে দেব। কনস্টেবলের নোট-ও আমি দেখেছি, ঠিক আছে। আপনাকে আর কষ্ট দেব না, চলি। সত্যিই অল্প কদিন এসেছেন এই মহলে, দু-দুটো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

—কি আর বলব। ধন্যবাদ।—শান্তকণ্ঠে জবাব দেন রেণর।

সাইকেল নিয়ে কনস্টেবল পোজার অপেক্ষা করছিল বাইরে। রেণর সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাঁদের।

—আমিও চলি। কাল আবার দেখা হবে।—করমর্দন করে বললেন কর্নেল।—রাতের ভোজে একদিন আসছেন কিন্তু, ঠিক ত'। আজ রাতেও আসতে পারেন, যদি মন চায়। তাতে মনটা হাল্কাও হবে। আপনার জন্যে আমার দরজা খোলাই থাকবে সব সময়। চলি।

—ধন্যবাদ।—বললেন রেণর।—এত' আপনার অসীম কৃপা। তবে, এসব ঝামেলা মিটে যাক আগে, তারপর অবশ্যই যাব।

এডিথের সঙ্গেও করমর্দন করলেন রেণর। এডিথ রেণরের হাতে তার আঙুলের অল্প একটু চাপ রাখল।

—দুঃখিত।—খুব নীচুগলায় বলল এডিথ।

রেণর তার হাতের ওপর একবার নিজের মাথাটা বুলিয়ে নিলেন। মুখ তুলেই দেখলেন খোলা সদর দরজার পথে ভিতর থেকে এক-জোড়া কৌতুক দৃষ্টি। ম্যাক্‌টাভিসের গাড়ি চলে গেছে। রেণর দেখেছেন তাঁর চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। কী অর্থ ঐ দৃষ্টির?

দাঁড়িয়ে থাকলেন রেণর সদর দরজায়। দেখলেন রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল কর্নেল আর তাঁর মেয়ের গাড়ি। তারপর ঢুকে এলেন বাড়ির ভিতর। বন্ধ করে দিলেন দরজা।

ডাইনিং রুমে ঢুকে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন রেণর। একমাথা চিন্তা। তার পর চুল্লীর কাছে এগিয়ে গিয়ে কল বেল বাজালেন।

বেল বাজতেই ডায়না এল। সরাসরি রেণর তাকালেন তার দিকে। কিছুক্ষণ আগে ওর মুখে-চোখে যে কৌতুক দৃষ্টি দেখেছিলেন, এখন তার আর কিছুই নেই। খুব শান্ত, ধীর।

—এ-কী মারাত্মক ঘটনা ঘটল, ডায়না?—বলেন রেণর।

কোন জবাব দিল না মেয়েটি। যেন বোবা। কোন কথা বলে না কেন? মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে রেণরের।

—আমার মনে হচ্ছে, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। তোমার মনে কোন রেখাই পাত করে নি।

—আমি কোন নকল পোশাক পরি না।

—তাহলে পড়ার মত সেরকম নকল পোশাক আছে?—রেণরের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে মেয়েটি রেণরের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফেরালো চলে যেতে।

দাঁড়াও, চলে যেও না।—বেশ নরম সুর রেণরের গলায়।—ছ্যাখ, আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এই সব ঘটনায়। কি বলতে গিয়ে হয়ত কি বলে ফেললাম, রাগ কোরো না। আমি দুঃখিত। আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে?

—কি কথা? বলুন।

—তুমি যখন আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে কি'ভাবে ঘটল, আমি তোমায় সব বলেছিলাম। শুনে তুমি বললে 'বুঝেছি'। তার মানে? কি বুঝেছ?

—বুঝলাম, জানালা থেকে পড়ে গেছে।

—আশ্চর্য! তা বুঝেও তোমার মনে কোন দুঃখ হল না? কষ্ট বোধ করলে না?

মেয়েটি মুহূর্তকাল অপলক তাকিয়ে রইল রেণরের দিকে। তারপর বলল—হ্যাঁ কষ্ট পেয়েছিলাম ওপরের সেই ঘরে গিয়ে, যে ঘর থেকে সে পড়ে গিয়েছিল।

রেণরের বুকটা সেকেণ্ডের জন্যে উত্তাল হয়ে উঠল।

—তার মানে? কি বলতে চাইছ?

—মানে দেখলাম, কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম পিসি অন্য এক বালতি নিয়ে জানালা সাফ করতে গিয়েছিল।

নির্বিকারভাবে কথাগুলি বলেই পিছন দিক থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল ডায়না।

॥ দশ ॥

নড়াচড়া করার মত শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন, রেণর। বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখ। বুঝতে পারছেন, কেমন ভাবে তিনি যেন দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। আগুন ভরা চোখ নিয়ে তিনি ডায়নার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেয়েটি তাহলে জেনে ফেলেছে। বালতির কথা যখন বলল, তখন তো আর কোন কথাই নেই। ও প্রসঙ্গ যদি না তুলত, তাহলে বোঝা যেত, কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু, ও যে জানতে পেরেছে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল।

আচ্ছা পুলিশকে জনানবন্দী দেবার সময় মেয়েটা বালতির কথা বলেছে কি? মনে প্রশ্নটা জাগতেই ভয়-ভয় ভাবটা রেণরের মধ্যে বেশ শিরশিরিয়ে ওঠে। যদি বলেই থাকে? কি প্রমাণিত হবে, তা দিয়ে? কিছু না। কোন কিছুই এ দিয়ে প্রমাণিত হবে না। প্রত্যেকটা বালতিই ভাল, প্রায় নতুন। কিন্তু কুড়ি বছর ধরে ধোয়া-মোছার জন্যে যে বালতিটা ব্যবহার করত মহিলা, আজ সেটা ভুল করল কিভাবে? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার এ একটা মোক্ষম সূত্র। ভাবতেই রেণর শিউরে উঠলেন।

আবার নিজেকে ঠিক করে নেবার চেষ্টা নিলেন রেণর। আতঙ্কের স্রোতে এভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। গতি-প্রকৃতি দেখে সেই মত···।

তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়ার দরকার। মদ প্রায় ছুঁতেনই না রেণর। ইদানীং যেন না হলে চলছে না। কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে ব্রাণ্ডির শিশি নিয়ে সোজা ঢেলে দিলেন গলায়, কোন কিছু না মিশিয়ে। ঘুরে এল মাথায় আবার সেই বালতির চিন্তা। মেয়েটা নিশ্চয় সন্দেহ করেছে। কিন্তু কেমন করে প্রমাণ করবে ?

হান্না মোফাতকে খুন করতে সে দেখেনি। কেউই দেখে নি। কেবল তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ—ঐ বালতি। ও টিকবে না।

আচ্ছা মহিলার সেই ঘুষ চাওয়ার ব্যাপারটা কি জানে মেয়েটা ? পুলিশকে কি বলেছে ? তার জন্যে আমি তাঁকে খুন করতে পারি, পুলিশ বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু প্রমাণ ? পুলিশকে যদি সে-সব কথা বলে থাকে···।

আবার আতঙ্ক যেন রেণরের বুকে চেপে ধরতে লাগল। কিন্তু না, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। যেভাবেই হোক ঘটনার মোকাবিলা তিনি করবেন। করতেই হবে।

এক পাত্র মদ আবার গলায় ঢেলে ঘুরে দাঁড়াতেই দরজায় টোকা। ঢুকল ডায়না। হাতে খাবারের থালা। রেণর আড়চোখে দেখলেন, থালা সাজাবার সময় ডায়নার চোখের দৃষ্টিটা যেন কিরকম।

—কি হল ?—জিজ্ঞেস করে ডায়না,—শরীর ভাল নয় ?

নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা নিলেন রেণর।

—ভাল। কেন ?—চেষ্টা করেও গলার স্বর শ্রুতিমধুর করতে পারলেন না—না, ভাল নয়, কিভাবে ভাল থাকব। সকালে যা

ঘটল, তারপর তোমার এই ব্যবহার…কিভাবে আমাকে ভাল রাখবে। তোমাকে দেখে, কেউ ভাবতেই পারবে না যে তোমারই পিসি অপমৃত্যু ঘটিয়ে ওপরের ঘরে পড়ে আছে।

—আপনি যদি চান আমাকে চোখের জলে বান ডাকাতে।—বলল ডায়না—ওসব আমার আসে না। আমি কাঁদুনে নয়।

—আমি জানি তুমি কাঁদুনে মেয়ে নও।—দারুন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রেণর—আমি চাই-ও না তুমি কেঁদে ভাসাও। আমি জানতে চাই, তুমি এই মন্তব্য কেন করলে যে তোমার পিসি ভুল বালতি নিয়ে জানালা সাফ করতে গিয়েছিল।

ডায়না এবার সরাসরি তাকাল তার দিকে। রেণর ঠিক বুঝতে পারলেন না—দৃষ্টিটা সন্দেহের না বিস্ময়ের। তারপর হেসে উঠল মেয়েটি।

—এ কথাটাই যদি আপনার উদ্বেগের কারণ হয়,—বলল ডায়না—সত্যিই আমার অবাক লাগছে, ধোয়া-মোছার জন্যে কুড়ি বছর ধরে যে বালতি পিসি ব্যবহার করে আসছে, আজ সকালে কিভাবে ভুল করে অন্য বালতি নিয়ে গিয়েছিল ?

—সেই একই বালতি যে তাকে আজও নিতেই হবে ? এই কথা বলতে চাও।—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ওঠেন রেণর।

—না, তার কোন মানে নেই।

—তাহলে ? তাহলে ও নিয়ে তুমি অত ঘ্যানর ঘ্যানর করছ কেন ?

—আমি ? কই ত' ঘ্যানর ঘ্যানর করিনি। আপনিই বরং…

—এই ভুল বালতির কথা পুলিশকে বলেছ ?—সরাসরি জিজ্ঞেস করেন রেণর।

—না, মোটেই না।—বলল মেয়েটি।—ও কথা পুলিশকে বলতে যাব কেন ?

ওঃ এই মুহূর্তে হঠাৎ তার সব বোঝা যেন হাল্কা হয়ে গেল। টান-

টান হয়েছিল যতগুলো পেশী, সব যেন আলগা হয়ে গেল। পাছে মুখে এই স্বস্তিবোধটা ফুটে উঠে ডায়নার চোখে পড়ে, তাই সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চুল্লীর কয়লাগুলো যেন ঠেলে দিতে গেলেন।

—নতুন বন্দোবস্ত তো এরপর একটা করতে হবে, তবে এই মুহূর্তে ওসব নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় নয়।—বললেন রেণর।—তবে আমার ইচ্ছে, তুমি এখানেই থাক, আর তোমার পিসির দায়িত্বটা তুমিই নাও। তার জন্যে সুযোগ-সুবিধে অবশ্যই তুমি পাবে। এ বাড়ির যা কিছু তোমার জিম্মাতেই থাকবে। রাজি আছ?

রেণরের দিকে অপলক দৃষ্টি ডায়নার।

—হ্যাঁ। আমি থাকতেই চাই।

—খুব ভাল কথা।—রেণর যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

রেণর যেন নিশ্চিত হলেন। বার্থা, হান্নার মৃত্যু নিয়ে যেসব রহস্য রয়েছে, ডায়না তাহলে সেসব কিছুই জানে না। সুতরাং, এরপর ওর দিক থেকে আর ভয়ের কোন সম্ভাবনা নেই।

—আপনি বাড়তি সুযোগ-সুবিধে বলতে লোকজনের কথা বলছেন?—ডায়না বলে।—এখনি ত মহলের সবকটা ঘর খোলার তো আর দরকার হচ্ছে না। যা আছে এটুকু আমি একাই দেখাশোনা করতে পারব।

—সেই ভাল কথা।—বলেন রেণর।—এখানে একগাদা চাকর-বাকরের ক্যাঁচ-ম্যাচ আমার ভাল লাগে না।

—আমারও না।—বলে ডায়না।

॥ এগারো ॥

প্রাতরাশ শেষ করে হাতে ছড়িগাছটা তুলে নিয়ে রেণর বেড়াতে বের হলেন। মহলে এসে অবধি একদিনের জন্যেও বাইরে বের

হয়নি। শরীরটার জন্যে একটু হাঁটা-চলার দরকার আছে। তাছাড়া যে দুর্বিষহ আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসেছে, তার থেকে মুক্তি পেতে হলে, ফাঁকা জায়গায় একটু বেরিয়ে আসা ভাল। অন্তত, মনটা প্রশান্ত হবে।

টার্ণের উল্টোদিকে নির্জন প্রান্তরের দিকে হাঁটতে সুরু করলেন তিনি।

হেমন্তের ধূসর বিকেল। নিস্তব্ধ, শান্ত—ধু ধু প্রান্তর। হঠাৎ করে ডেকে ওঠা দু-চারটে পাখির ডাক ছাড়া, কোন শব্দ নেই কোথাও। একেবারে থমথমে, নিঝ্‌ঝুম প্রান্তর পথ চলে গেছে দূরে চেভিয়েট পাহাড়ে।

খুবই শান্ত পরিবেশ। মন্থর পায়ে দেখতে দেখতে চলেছেন রেণর—শান্ত এই প্রকৃতির প্রশান্তিতে একটু শান্তি পেতে।

অশান্ত মনটাকে শান্ত করতেই তিনি বাইরে বেড়িয়েছেন। অথচ, মহল থেকে বেরিয়ে অবধি ঘুরে-ফিরে বারবার মনে আসতে শুরু করল মহলের সেই বিভীষিকা, আচ্ছন্ন করতে সুরু করল তাঁর মনকে।

আচ্ছা এটা কি সম্ভব, এই ক্লাইভ রেণর, লেখক হিসেবে চারদিকে যার এত সুনাম, সে খুনী! তা-ও একটা নয়, দু-দুটো মহিলাকে খুন করেছে! কেউ কি এই মুহূর্তে তাঁকে দেখে বিশ্বাস করবে?

কিন্তু, এটা ত সত্যি। অস্বীকার করার নেই। নিজে হাতেই —হ্যাঁ, সজ্ঞানে নিজের হাতেই তিনি দু-দুটো মহিলাকে এত অল্প-দিনের মধ্যে খুন করে ফেললেন কৌশলে। চিন্তাটা আসতেই যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

মাত্র দিন পনের আগেও, আর পাঁচজন মানুষের মত তিনিও ত' ছিলেন নিরীহ, সাধারণ মানুষ,—লোকে সম্মান করত, ভালবাসত, —কোন বন্ধুর বাড়ি গেলে খাতির-যত্ন পেত।

আচ্ছা, এখন যদি তারা জানতে পারে যে, আসলে আমি একটা শয়তান, একটা খুনী।—তারা কী আমার দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না? আর কি কোন সম্পর্ক রাখবে আমার সঙ্গে—সেই মধুর ভালবাসার সম্পর্ক। অবশ্যই না।

এই ক্লাইভ রেণর, কী সেই রেণর। না। এখনকার এই রেণরের স্রষ্টা তিনি নিজে। যার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে ফাঁসির মঞ্চ।

দ্রুত পা চালালেন রেণর। এই মুহূর্তে ওসব কথা আদৌ ভাববেন না। মন থেকে ওসব এই মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিতে চান তিনি। কিন্তু, মহল থেকে বের হওয়ার পর থেকেই ছায়ার মত এমনভাবে চিন্তা অনুসরণ করে চলেছে তাঁকে, যে কোনমতেই চেষ্টা করেও পারছেন না—পারছেন না নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্যমনস্ক রাখতে।

শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। পারলেন না নিজেকে সামলে রাখতে। মুখ ফেরালেন মহলের দিকে। ফিরে যাবেন মহলেই। দ্রুত পা চালাতে লাগলেন। শেষে প্রায় যেন দৌড় দিয়ে এসে ঢুকে পড়লেন মহলে। মুখ-চোখে অবসাদ। দেখলেই মনে হবে, কোন কিছুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

টুপি আর ছড়ি যথাস্থানে রেখে ঢুকলেন ডাইনিং রুমে। বিকেল গড়িয়ে বাইরে তখন সন্ধ্যে নামছে। চুল্লী থেকে আগুনের শিখায় চার দেওয়ালে কি ছায়া-ছায়া' যেন কিসের নৃত্য।

চুল্লীর কাছে আরাম কেদারাটা টেনে নিয়ে পা-দুটো টান টান করে বসলেন তিনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন চুল্লীর গনগনে কয়লার দিকে।

বসার পর থেকেই আস্তে আস্তে সব ভয় আতঙ্ক যেন মিলিয়ে যেতে শুরু করল মন থেকে।—কে যেন বুলিয়ে দিতে সুরু করল তার মিষ্টি যাদু হাত। শান্তি…শান্তি…খুব শান্ত হয়ে আসছে মনটা। কেটে যাচ্ছে নিজেকে নিয়ে এতক্ষণের সব উদ্বেগ।

কেটে গেল। একেবারে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন তিনি।

অপরাধ! কোন অপরাধ! কিসের অপরাধ! না—কোন অপরাধে তিনি অপরাধী নন। উত্তপ্ত এই ঘর, নিস্তব্ধ এই মহল মুহূর্তে তাঁর মন থেকে সব কিছু যেন ঝেড়ে ফেলে দিল। মনে হল রেণরের এই মহল তাঁকে যেন এক নিরাপদ পক্ষপুটে আশ্রয় দিল।

ভাবতে চেষ্টা করেন রেণর, কেমন করে এটা সম্ভব? নিস্তব্ধ প্রান্তর, তাঁকে এত ভীত করে তুলেছিল কেন? কেন তাঁর মনকে বিষাদে ভরিয়ে দিচ্ছিল? আর···আর মহলে ঢোকার পরই অনুভব করতে সুরু করলেন এমন শান্তি, এমন নিরাপত্তা?

সেই সময় বোধ হয় নির্মম সত্যটাই ভেসে উঠেছিল রেণরের মনে। বোধ হয় মনের গভীরে এই চিন্তাটাই ডালপালা মেলতে সুরু করেছিল যে, মহলটা, শুনে এসেছেন, ভাল নয়; খুনী মহল। পুরোনো ঐ মহলের প্রতিটি পাথর বোধ হয় যোগায় খুনের উত্তেজনা আর ফিসফিস করে বলে, এতে কোন অপরাধ নেই; এটাই জীবন।

যদি রেণরের মনে একথা জেগেও থাকে, তবে তা ক্ষণিকের জন্যে জেগে আবার মিলিয়ে গিয়েছিল। এখন আজ ওসব কোন চিন্তাই তাঁর মায়াই নেই। নিজের বাড়িতে যেন নিশ্চিন্ত মনে এখন তিনি।

সিগারেট ধরিয়ে আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে পায়ে পায়ে এবার তিনি এগিয়ে চললেন রান্নাঘরের দিকে।

কিন্তু রান্নাঘরের দরজা একটু খুলেই থমকে গেলেন রেণর। দেখলেন, ঘরে ডায়নার মুখোমুখি বসে বব ফারগাস।—ডায়নাকে ভালবাসে।

রেণরকে দেখেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে দাঁড়াল ছোকরা বব, তার খুব ভয় হল রেণর এখনই না তাকে দূর···দূর···করে ওঠে।

—তুমি বস, বব।—ধীর গলায় বলে মেয়েটি।

—ডায়না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।—বেশ রুক্ষ শোনাল রেণরের স্বর।

মুখ ঘুরিয়ে রেণর ফিরে এলেন ডাইনিং রুমে। কয়েক মিনিট পরেই এল ডায়না।

—বসুন।

তুর্দ্ধর্ষ এক পাগল-ক্রোধ যেন পেয়ে বসল রেণরকে।

—আমি চাই না, ঐ ছেলেটা এদিকে ঘুরঘুর করুক।—বেশ গম্ভীর রেণর।

মেয়েটার চোখ তুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

—এটা আপনার বাড়ি। আপনি যদি ওকে আসতে নিষেধ করেন, আমি বারণ করে দেব।—বলে মেয়েটি।—তবে, বব যদি যায়, আমিও চলে যাব। সক্রুশ ব্যাঙ্কের দরজা আমার জন্যে সব সময়ই খোলা। আসলে, ও আজ এই কথাই আমাকে বলতে এসেছিল।

কোনরকমে নিজেকে সামলে রাখলেন রেণর নিজেকে।

—এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাও—কেন?

—বাড়িটাতে যারা থাকে, তাদের ভাগ্যে কী ঘটে, তাই দেখেই ওর একটু ভয়—শান্তভাবেই বলে মেয়েটি।—তার ওপর··· আপনাকেও ওর যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ধক্ করে জ্বলে উঠল যেন রেণরের চোখ; ফারগাসের প্রতি তীব্র ঘৃণা।

দরজা দিয়ে প্রায় দৌড়েই ফারগাসের দিকে বেরিয়ে যেতে গিয়েই বাধা পেলেন দরজায়। তুহাত ছড়িয়ে পথ আগলে ডায়না।

—না। ওকে কিছু করতে পারবেন না।—ফোঁস করে ওঠে ডায়না।

অশ্রাব্য গালি-গালাজ যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল রেণরের মুখ থেকে। তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা নিয়েও যখন পারলেন

না, দুহাতে তার গলাটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে সুরু করলেন।

—বব!—চিৎকার করে ওঠে ডায়না।

সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল ফারগাস।

রেণর অনুভব করলেন, এক শক্ত সবল হাত যেন সাঁড়াসির মত এসে চেপে বসল তাঁর কাঁধে, মুখের ওপর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন যেন ঘড়-ঘড় করে উঠল; মেয়েটার গলার শক্ত মুঠিটা তাঁর আলগা হয়ে গেল; তাঁর থুতনিতে এসে আঘাত হানল একটা কঠিন মুঠো; ছিটকে পড়লেন প্রায় চুল্লীর কাছে গিয়ে।

॥ বারো ॥

আস্তে আস্তে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রেণর। একটা হাত তাঁর থুতনির আঘাতে। দোরগোড়ায় ডায়নাকে আগলে দাঁড়িয়ে ফারগাস।

রাগে তখনো গর্জন করছে সে। অশ্রাব্য গ্রাম্য ভাষা তার মুখে।

—মেয়ের গায়ে হাত তোলা? শয়তান। ইচ্ছে হচ্ছে বেশ করে আরও ঘা-কতক দিই···।—গর-গর করতে-করতে বলে ফারগাস।

—বেরিয়ে যাও।—কথা বের হয় রেণরের গলা থেকে।

—যাব ত' নিশ্চয়ই।—চীৎকার করে ওঠে ফারগাস।—ডায়নাও যাবে আমার সঙ্গে। তোর মত শয়তানের কাছে আমি ওকে একা রেখে যাব না।

—বে-রি-য়ে যাও।—আবার বলেন রেণর।

—চলেই যাচ্ছি। তোর মত লোকের কাছে আমরা কেউ থাকতে আসিনি।—বলে বব তাকাল মেয়েটির দিকে।—চল ডায়না।। চল আমার সঙ্গে আমাদের সক্রশ ব্যাঙ্কে। মা তোমাকে

পেয়ে খুব খুশী হবে। হয় কাল সকালে নয়ত তোমার পিসির সৎকার হয়ে গেলে, লোক পাঠিয়ে তোমার জিনিস-পত্তর এখান থেকে নিয়ে যাব। তোমার পিসির যা কিছু আছে, সেগুলো ত' আমাদেরই। সেগুলোও নিয়ে যাওয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না মেয়েটি। নিরীক্ষণ করতে লাগল রেণরকে। থুতনিতে হাত দিয়ে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রেণর; তাকিয়ে মেঝের দিকে ধীরে ধীরে এরপর সে মুখ তুলে তাকাল। ডায়না দেখল সেই দৃষ্টির গভীরে এক তীব্র ঘৃণা।

—চলে এস, বব।—বলল মেয়েটি। কোন উত্তেজনা নেই।

ঘর থেকে দুজনেই বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল মেয়েটি। ঘরে এখন একা রেণর। কার্পেটের দিকে মুখ নীচু করে তখনো দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

যন্ত্রনা, রাগ, অপমান—গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগল রেণরের। মনে তাঁর যেন সূঁচ বিঁধতে লাগল—তাঁরই বড়িতে তাঁকেই মেরে বসল কোথাকার কে এক ছোকরা আর তিনি তাকে ঠেকাতে পারলেন না! এর চেয়ে অপমান আর কি আছে? ঠেকাতে গেলেও যে পারতেন, তার অবশ্যই কোন সম্ভাবনা ছিল না, রেণর তা বিলক্ষণ জানতেন। গাঁট্টা-গোট্টা শাবলের মত শক্ত মাংসপেশী! ওর সঙ্গে ঘুসো-ঘুসিতে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

ঘুঁসো-ঘুঁসি! হ্যাঁ ঘুঁসো-ঘুঁসি! মনে-মনে যেন আউড়ে উঠলেন রেণর—ব্যাটা গেঁয়ো, শরীর দিয়ে পার পেয়ে গেলি, কিন্তু মগজ দিয়ে! হ্যাঁ···হ্যাঁ···মগজ দিয়ে ঠেকাতে পারবি? ঐ পেশী ছাতু হয়ে যাবে।

বিষধর একটা সাপ যেন দংশন করল রেণরকে। চিন-চিন, ঝিন-ঝিন, রি-রি করে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। বব ফারগাসের ওপর তীব্র ঘৃণায় যেন জ্বলে উঠলেন তিনি। এত ক্রোধ, এত ঘৃণা, ইতিমধ্যে কারোর প্রতি জাগেনি রেণরের। চোখ দুটো আবার

তাঁর লাল হয়ে উঠল, যেন একজোড়া জ্বলন্ত অঙ্গার।

তবুও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল তিনি গভীরভাবে ভেবে নিলেন। তারপরই চকচক করে উঠল তাঁর চোখ।

না, কোন জবাব পাওয়ার আনন্দে চকচক করে ওঠেনি তাঁর চোখ। এই মুহূর্তে ঐ গেঁয়ো বর্বর বব ফারগাস যা করে গেল তার সমুচিত কোন জবাব যে তিনি পেয়ে গেলেন এবং তারই জন্যে সজাগ হয়ে উঠলেন, তা নয়। কীভাবে এই অপমানের একশ' গুণ তিনি আদায় নেবেন, এখনও তা জানেন না তিনি, স্থির করতে পারেন নি। তবে, জানেন, তিনি পারবেন, পাবেন নিশ্চয়ই প্রতিশোধের সূত্র।

হঠাৎ হাসির ধমকে ফেটে পড়লেন রেণর। মেরুদণ্ড সোজা করে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন দোতলায়; ভালভাবে ধুয়ে নিলেন মুখ-চোখ। এলেন শোবার ঘরে। দেরাজের চাবি খুলে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানা বের করে নিলেন।

নীচে ডাইনিংরুমে নেমে এসে চেয়ারে বসলেন রেণর। পাণ্ডুলিপিগুলো রাখলেন টেবিলের ওপর। কয়েকটা পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে, তার নায়ক ক্লড বয়সটন যেখানে এসে থেমে ছিল, সেখান পর্যন্ত এলেন রেণর। তার পর থেকে আবার সুরু করলেন।

কর্নেল ব্ল্যাকনে আর তাঁর মেয়ে এডিথের ছটো ছদ্ম নাম দিলেন। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের পরিণাম হিসেবে রয়সটন তাকে কৌশলে ওপরের ঘরে এনে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে তাকে খতম করেছে। সেই সকালে একটু পরেই ছদ্মবেশী কর্নেল ব্ল্যাকনে আর এডিথ এসেছেন তার বাড়িতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে। এবং তার পর থেকে যা যা ঘটে গিয়েছিল, তা খুঁটিয়ে লিখে চললেন রেণর।

খুব দ্রুত লিখে চলেছেন রেণর। ঘটনার পর ঘটনা অতিক্রম

করতে করতে তাঁর নায়ক এল একঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া ঘটে· ঘটনার কাছাকাছি। লিখে ফেললেন তার রান্নাঘরে যাওয়া, বব ফরগাসকে সেখানে দেখে ফেলা; তারপর ডাইনিং রুমে যা ঘটে· গেল তার দৃশ্য।

একটুও বিরতি নেই। একটানা চলেছে কলম। পাশে জমে উঠছে একটার পর একটা পৃষ্ঠা। নিস্তব্ধ ঘরে কেবলমাত্র কলমের খসখস শব্দ।

সন্ধ্যে পর্যন্ত যা কিছু ঘটে গেল, তা, লেখা হয়ে গেল রয়সটনের। একটু ক্লান্তি নেই। পরিবর্তে এক উদ্দীপনা—দারুণ উদ্দীপনায় লিখে চলেছেন তিনি। মন যেন সুতো ছেড়ে চলেছে অবিরাম। আর তা গুটিয়ে চলেছেন রেণর। গুটিয়ে চলেছেন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে।

লিখতে-লিখতে কখনো ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে তাঁর মৃদু হাসি, কখনো, টেনে যাচ্ছে চোখের কোল, কখনো ফুটে উঠছে কপালের ভাঁজে রেখা—মনে হচ্ছে, বেশ যেন একটা মেজাজ অনুভব করছেন তিনি লেখার মধ্যে। নির্জন ঘর—বিরামহীন লেখার গতি —সজাগ রেণর, যদিও লেখায় বিভোর। তবুও হঠাৎ যেন মনে হল তাঁর, ঘরে তিনি একা নন। আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝপ্ করে থেমে গেল কলম।

মুখ তুলতেই দেখলেন টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ডায়না। তাকিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে।

—কী চাই এখানে?—ঝঁপিয়ে উঠলেন রেণর।

—দুপুরের খাবার কখন খাবেন।—জানতে চাইল মেয়েটি।—দুবার ডেকেছি, কোন সাড়া পাই নি।

—আমি শুনতে পাই নি'—বললেন রেণর।—আমার খাবার দরকার নেই। খুব ব্যস্ত। তা তুমি এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে-ড়িয়ে কী করছ? আমি ত' ভেবেছিলাম, তুমি সক্রেস বাক্সে

চলে গেছ।

—না, আমি ত' কখনো যাবার ইচ্ছে জানাই নি।—বলে মেয়েটি—ওটা ববের কথা, আমার নয়।

রেণর ঝপ করে মলম নামিয়ে রাখলেন।

—শোন, ওটা আমারও কথা।—বেশ রুক্ষস্বর রেণরের—এখানে তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাই না। তুমি চলে যেতে পার।

—সত্যিই কি তাই চান?

—হ্যাঁ। আমি তাই চাই।—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ওঠেন রেণর—ঐ মুখ্খু, গাড়োল বর্বরটার সঙ্গে ফুসফুস করা আর ওদের গোশালা পরিষ্কার করার কাজই তোমার ভাল লাগবে। যাও।

হাসল মেয়েটি।

—হায়রে! আক্রোশটা দমন করতে পারছেন না।

গায়ে যেন হঠাৎ কে জ্বালা ধরিয়ে দিল রেণরের। ঝপ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।

—কি বললে?—গর্জন করে ওঠেন রেণর।—এত বড় কথা বলার সাহস পেলে কোথা থেকে। যাও···বেরিয়ে যাও···বেরিয়ে যাও এখনি। নইলে ধাক্কা মারতে-মারতে বাড়ি থেকে বের করে দেব।

মেয়েটি ইতিমধ্যে পিছু ফিরেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। রাগে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে রেণর দেখলেন ওর চলে যাওয়া।

শেষে সামলে নিয়ে রেণর আবার চেয়ারে বসলেন। এখনই আবার কলম নিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। কাহিনীর সুতো কেটে গেছে। বিলক্ষণ জানেন রেণর, এখন চেষ্টা করলেও লেখা যাবে না।

তখনো উত্তেজনায় আঙ্গুলগুলো কাঁপছিল রেণরের। সেই অবস্থাতেই এইমাত্র লেখা পৃষ্ঠাগুলো একজায়গায় জড়ো করে, ঠিক করে রাখলেন। তারপর চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়তে সুরু করলেন।

পড়তে পড়তে স্তিমিত হয়ে এল উত্তেজনা; আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল রেণরের মুখ আর সেই মুখে ফুটে উঠতে লাগল একটা চতুর, কুটীল হাসি। মুক্তোর মত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় তিনি দেখতে পেলেন, বব ফারগাসের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি আছে, তা ঠিক হয়ে গেছে।

নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক সেই পরিণতি। আর তা হবে অপরের মাধ্যমে। আবার সে মাধ্যমটি হবে নিতান্ত নিরীহ, গোবেচারা।—যাকে কেউ কোনদিন সন্দেহও করতে পারবে না। ক্লাইভ রেণরের সঙ্গে এ-ব্যাপাবের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকবে না।

রেণরের কাছে এখন আর কিছু অস্বচ্ছ নেই। হাজারগুণ প্রতিশোধ…হাজারগুণ প্রতিশোধ বব ফারগাসের ওপর কিভাবে নেওয়া যাবে, এখন রেণরের চোখের সামনে তা জ্বলজ্বল করে ভাসতে সুরু করল।

॥ তেরো ॥

পরিষ্কারভাবে পাণ্ডুলিপিগুলি পরপর গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রেণর। সিগারেট ধরালেন। এগিয়ে গেলেন তাকের কাছে। বোতল থেকে ঢেলে নিলেন এক মাত্র মদ।

হাতে মদের পাত্র। দাঁড়ালেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। মনে মনে আওড়ালেন, গ্রেলিংসে তাঁর কাহিনীর নায়ক ক্লড রয়স্টনের কয়েকটা অধ্যায় লেখা হল। মনে মনে একটু তৃপ্তি অনুভব করলেন।

যদিও এই কাহিনী তাঁকেই কেন্দ্র করে এবং ক্রম ম্যানরের। তবুও লেখা হয়েছে অপূর্ব। এখন কাহিনীর গতি পৃষ্ঠায় যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে, তা ঠিকঠিক ঘটবে, কিভাবে? ঘরটাকে

ধন্যবাদ জানালেন রেণর। লেখার সময় অপূর্ব এক প্রেরণা যোগায়

তাকে গ্লাসটা নামিযে রেখে রেণব তাকালেন ঘড়ির দিকে। প্রায় সাড়ে দশটা মনে হল এবার ক্ষিধে পেয়েছে। খাবার আগে ঐ আজব মেয়েটকে অমনভাবে দূর দুব কবে তাড়িয়ে দিলেই বোধ হয় ভাল হত।

কী নিস্তব্ধ বাড়ি, যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। কান পেতে শুনলেন কোথাও কোন কিছু নড়া-চড়ারও শব্দ নেই। মনে হল রেণরের এই মুহূর্তে, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাপটি দিয়ে বসে আড়ালে কোন পশু, শিকারের অপেক্ষায়।

না, এ চিন্তা আসছে কেন? এ বাড়ি তাঁর—তাঁর নিজের। বেশ সুখ আর শান্তি। তবুও···যেন বড় একা···একা।

একা! নিজের মনেই নিজে চমকে ওঠেন রেণর। না, তিনি ত' একা নন। হান্না মোফাতের দেহটা রয়েছে তার শোবার ঘরে।

আবার একপাত্র মদ নিয়ে গলায় ঢেলে দিলেন। অনেকখানি মনে মনে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

শোবার ঘরে হান্না রয়েছে, ঠিকই। কিন্তু সে' ত মরা! তার কি ক্ষতি করবে।

আরও এক পাত্র মদ ঢাললেন গলায়। ব্যাস্। হান্নার সম্বন্ধে আর কোনআতঙ্ক বা চিন্তাই রইল না তাঁর মাথায়। ঠিক করলেন, সেই কাগজের টুকরো এবার খুঁজে দেখতে হবে, বের করতে হবে। এ বাড়িতে এখন আর কেউ নেই, তিনি ছাড়া। তন্ন-তন্ন করে সব জায়গা এখন নিশ্চিন্তে খুঁজে দেখতে পারবেন।

তেতলায় উঠে হান্না মোফাতের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালেন। তারপর পেরিয়ে, ডায়নার দরজার হাতল ঘোরালেন।

দরজায় চাবি। হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা দিলেন রেণর।

—ডায়না!—ডাকলেন—ডায়না কি ভিতরে রয়েছে?

রেণরের ডাক শুধু প্রতিধ্বনিতই হল। কোন সাড়া মিলল না। আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন তিনি:

—ডায়না কি ভিতরে?

না। এবারেও কোন প্রত্যুত্তর নেই থমথমে নিস্তব্ধতা। না, মেয়েটি তাহলে চলেই গেছে। দরজায় চাবি লাগিয়ে গেছে, পাছে কেউ ঢোকে, তার জিনিসপত্র ঘাঁটে। কথা ছিল বব ফারগাস পরে এসে সবকিছু নিয়ে যাবে। সেইজন্যেই বোধ হয় ডায়নার এই সাবধানতা।

এগিয়ে এলেন হান্নার ঘরের দরজার সামনে। সন্তর্পনে হাতল ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকলেন রেণর ঘরে। যদিও অনেক বেশী সচেতন, সজাগ, তবু ধুকধুক করছে বুকটা কাঁপছে আঙ্গুলগুলো। কাঁপছে হাতের বাতি।

দেওয়ালের গায়ে একানে বিছানায় শুয়ে আছে মহিলা। আপাদ-মস্তক ঢাকা। পাংশু মুখে, বাতির সেই স্বল্প আলোয় কিছুক্ষণ নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই নিঃশব্দ, নিশ্চল দেহটা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল সেইভাবে রেণরের। তারপর, যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে এগিয়ে ড্রেসিং টেবিলের দিকে। বাতিটা রাখলেন সেখানে।

সুরু করে দিলেন কাজ। প্রথম ড্রয়ারটা খুলে হাত বুলিয়ে দেখলেন, রুমাল, কয়েকটা কালো উলের মোজা, পুরোনো দস্তানা— আর কিছু টুকিটাকি। বন্ধ করে, খুললেন দ্বিতীয় ড্রয়ার। দেখলেন, বেশ ধোপ দুরস্ত ভাঁজ করা গোটাকয় পোশক। সেটাও বন্ধ করে খুললেন নীচেরটা। বাতিটা নামিয়ে নিয়ে রাখলেন মেঝেতে। ড্রয়ারটা টেনে বের করে ধরলেন আলোর কাছে। এলেও কয়েকটা অ্যাপ্রন, ব্লাউজ, পরিপাটিভাবে ভাঁজ করা। সব নীচে রেণর দেখতে পেলেন ফিতে জড়ানো কযকগুলো চিঠি আর কাগজপত্রের

একটা বাণ্ডিল।

ফিতের ফাঁস খুলে রেণর দ্রুত চিঠিগুলো দেখতে সুরু করলেন। পড়া নয়, খামগুলো ফাঁক করে শুধু দেখে যেতে লাগলেন এগুলোর মধ্যে কোথাও সেই কাগজের টুকরোটা আছে কি না।

হঠাৎ একটা কাগজের ওপর নজর পড়তেই চোখ কুঁচকে গেল রেণরের। দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। একটা সরকারি কাগজ। একটা জন্ম-নথি। চোখ পড়ল ডায়নার নামের ওপর।

বাতিটাকে আরও কাছে এনে নথির লেখার ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখলেন—এটা ডায়নার জন্ম সময়ের প্রমাণপত্র। কিন্তু অন্য নামগুলোর দিকে চোখ পড়তেই দম যেন বন্ধ হয়ে এল রেণরের।

ডায়না হল সেই মেজর বারটনের মেয়ে, কুড়ি বছর আগে এই বাড়িতে যার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। আর হান্না মোফাত, তার পিসি নয়, ডায়নার নিজের মা।

চোখকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না রেণর। বারবার দেখলেন। না, কোথাও কোন ভুল দেখছেন না। কাগজটাও নকল নয়। সরকারি শীলমোহর দেওয়া, রেজিষ্ট্রারের সই।—কাগজে-কলমে একেবারে পাকা।

এই মুহূর্তে সন্দেহ জাগে রেণরের মনে। ডায়না কি জানে এই হান্না তার মা, পিসি নয়। নিশ্চয়ই জানে না। কোথাও এর নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।

ডায়না সম্বন্ধে আবার নতুনভাবে আগ্রহ জাগে রেণরর মনে। সামনে থাকলে একবার বাজিয়ে দেখতেন তাকে। এ ব্যাপারে কতখানি সে জানে।

মেঝেতে বাতির আলোয় সেই কাগজটায় এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন রেণর যে, ঠিক পিছনে কোন নড়াচড়ার শব্দটুকুও তাঁর কানে যায় নি। হঠাৎ একটা হাত এসে পড়ল তাঁর কাঁধে। ভয়ে

আতঙ্কে মুহূর্তে তাঁর শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহ জমে যেন বরফ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ রেণর আদৌ নড়াচড়া করলেন না। করতে পারলেন না। তারপর ভয়ে ঘোলাটে চোখ নিয়ে কোনরকমে মাথাটা ঘোরালেন। পর মুহূর্তেই একটা আর্ত চীৎকার যেন ঠেলে বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। প্রায় লাফিয়ে উঠে, বাতি ফেলেই পড়ি-মরি করে দৌড় দিতে গিয়ে উল্টে পড়েছিলেন ঘরে বাতির ওপরেই। নিভে গিয়েছিল বাতি। অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল ঘর।

বিশ্বাস করতে না পারলেও, ক্লাইভ রেণর স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তার কাঁধে হাত রেখে যে শ্বেতকায়টি দাঁড়িয়েছিল, সে আর কোথাও থেকে আসে নি ; উঠে এসেছিল হান্নার মৃত্যুশয্যা থেকে।

॥ চৌদ্দ ॥

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় যেখানে পড়েছিলেন রেণর সেখানেই পড়ে রইলেন ভয়ে গোঁ…গোঁ…করতে করতে। নড়তে পারলেন না, চেষ্টাও করতে পারলেন না—হাত-পাগুলো যেন সব অবশ হয়ে গেছে।

কানে এল তাঁর এক খস্‌খস শব্দ…দেশলাই জ্বালাবার মত। কেটে গেল ঘরের অন্ধকার। জ্বলে উঠল আলো। ভয়ে বড় বড় চোখ রেণরের—দেখলো এবার কোনরকমে ঘাড় ফিরিয়ে, সামনে সেই শ্বেতাবয়ব। হাতে তার জ্বলন্ত দেশলাই। কথা বলছে।

—এখানে কি হচ্ছে ?

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন রেণর। এ যে ডায়নার গলা!

বাতির আলোয় ভালভাবে দেখলেন এবার রেণর। হ্যাঁ ঐ তো ডায়নার সেই মিষ্টি-মিষ্টি মুখ। সাদা সিল্কের পোশাক পরণে।

নিভে গেল দেশলাই—জ্বালাল মেয়েটি আর একটি।

—উঠে পড়ুন—মেয়েটির গলায় অধীর স্বর।—এখনও বুঝতে পারছেন না, কেমন বোকার মত পড়ে আছেন? আপনার বাতি কোথায়?

ঝুঁকে এবার মেয়েটি কুড়িয়ে নিল বাতি, জ্বালিয়ে সেটি বসিয়ে দিল ড্রেসিং টেবিলের ওপর।

—আমি ভেবে পাই না,—কাটা কাটা কথা মেয়েটির—এ ঘরে আপনার কি দরকার? কি করছিলেন এখানে?

নিরুত্তর রেণর। মেঝেয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাগজপত্রের দিকে এবার নজর পড়ল মেয়েটির। প্রথমেই চোখে পড়ল তার সেই জন্মের প্রমাণ পত্রটা।

—বুঝতে পারলাম।—খুব ঠাণ্ডা গলায় মেয়েটি বলল—আপনি পিসির জিনিসপত্র ঘাঁটছেন, কেন? না, এখানে কোন কথা হবে না। নীচে যান। আমি এগুলো গুছিয়ে আসছি। ওখানেই কথা হবে।

উঠে দাঁড়ালেন রেণর। ড্রেসিং টেবিলটা ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়ালেন। কেমন যেন বোকা-বোকা।—তুমি···তুমি আমাকে এইভাবে ভয় দেখালে!—

তখনো কাঁপছে তাঁর শরীর। এত আতঙ্ক তিনি কখনো পেয়েছেন বলে মনে করতে পারেন না। কোনদিন কোন অবস্থাতেই তিনি কল্পনা করতে পারেন নি, এমন আতঙ্কগ্রস্ত তাঁকে হতে হবে।

তবুও নির্বাক হতে হল তাঁকে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে নেমে আসতে সুরু করলেন নীচেয়। সিঁড়ি ঘিরে যেন বিকট অন্ধকার। এলেন ডাইনিং রুমে। এক পাত্র মদ ঢেলে নিলেন। কিন্তু এত কাঁপছিল হাত, যে খানিকটা চলকেই গেল। গ্লাসটা মুখে তুলে চুমুক দিতে গিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে দাঁতেই লেগে গেল।

একেবারে নির্ভেজাল ব্র্যাণ্ডি। কোনরকমে গলায় ঢেলে

এগিয়ে গেলেন আগুনের দিকে। দারুণ ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা লাগছে তাঁর !···কনকন করছে হাতগুলো। চুল্লীর গনগনে আগুনের ওপর মেলে ধরলেন হাত দুটো।

—ওঃ !—ফিস্‌ফিস্ করে আপন মনেই বলে উঠলেন তিনি।

দরজা ঠেলে মেয়েটি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার আঁৎকে উঠে ফিরে তাকালেন রেণর। দেখলেন, গায়ে রাতের সাদা পোশাক, তার ওপর একটা পাতলা চাদর; খালি পায়ে ডায়না এসে ঢুকল।

হ্যাঁ, এবার বলুন, পিসি হান্নার শোবার ঘরে কি করছিলেন আপনি ?—সরাসরি জানতে চাইল ডায়না।

—আমি···আমি একটা জিনিষ খুঁজছিলাম।—বললেন রেণর।

—কি খুঁজছিলেন ?

—আমি বলতে পারি না।—প্রত্যাখান জানালেন রেণর।—বলতে পারব না।

—দেখুন ত' এইটে খুঁজছিলেন কিনা ?

তাকিয়ে দেখলেন রেণর। মেয়েটির হাতে সেই আধ-পোড়া কাগজটা। খুব ধীরে ধীরে মেয়েটি সেই কাগজটার ভাঁজ খুলে মেলে ধরল রেণরের সামনে দারুণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন রেণর দেখে যে তারই হাতে পাওনাদার জেমস লুইসের সেই আধপোড়া কাগজের টুকরোটা।

—তুমি···তুমি তাহলে জান ?—যেন হাঁফিয়ে উঠলেন রেণর। গলার স্বর নেমে গেছে অস্বাভাবিক খাদে।

—জানি ? কি জানি ?

—যে তোমার পিসি আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ, জানতাম।—নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর ডায়নার।

শুনে চমকে উঠলেন রেণর। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

তা যদি জেনে থাকে, তাহলে আরও কতখানি জানতে পাবে? হান্না মোফাতের মৃত্যু সম্বন্ধে ওর মনে কি তাহলে কোন সন্দেহ আছে?

ক্ষিপ্র হাতে মেয়েটি এবার সেই কাগজের টুকরোটা ছুঁড়ে দিল রেণরের সামনেই চুল্লীর জ্বলন্ত আগুনে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল কাগজটা।

—এবার বোধ হয় আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন?

না, পারেন নি। বরং আরও যেন ভীত হয়ে পড়লেন। এক-গাদা চিন্তা মাথার মধ্যে যেন তুফান তুলল। ভাবতে পারছেন না…স্থিরভাবে যেন কোন কিছুই ভাবতে পারছেন না।

—কাগজের টুকরোটা পুড়িয়ে ফেললে কেন? যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন রেণর।

—কারণ, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।—বলল মেয়েটি —এটা দেখিয়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।

—কিন্তু, তোমার পিসি যখন করতে চেয়েছিল, তখন তো তাকে বাধা দাও নি।—এবার যেন ফেটে পড়লেন রেণর। তারপর প্রায় চোখ বুজেই বলে ফেললেন—হান্না তোমার পিসি নয়, পিসি নয়… তোমার মা।

—তাও আমি জানি।—তেমনি নিরুত্তাপ জবাব মেয়েটির।

—তুমি জানতে?—অবাক হলেন রেণর,—কিন্তু দেখে ত' মনে হয়…না, তুমি জানতে। আজ তোমার মা মারা গেল, তার জন্যে এতটুকু শোক ত' দেখলাম না তোমার মধ্যে।

—আমি কখনো তাকে ভালবাসতে পারিনি।—ডায়নার চোখে অতল দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে রেণরের দিকে।—এখনও কী জানতে পারেন নি যে এ-বাড়িতে কোন ভালবাসা নেই। ভালবাসা এখানে থাকতে পারে না?

—কি....কি বলছ. আমি ত' ঠিক বুঝতে পারছি না।—তোৎলাতে

সুরু করলেন রেণর।

—বুঝতে পারছেন না?—বলল মেয়েটি।—ভাবুন, ভেবে দেখুন। যেদিন থেকে আপনি এই বাড়িতে এসেছেন, সেদিন থেকে আপনি, যাকে স্বাভাবিক, সুন্দর বলা যায়, এমন কোন ভাবনা ভাবতে পেরেছেন?

—জানি না,—থেমে থেমে বলেন রেণর।—ঠিক বলতে পারব না। নয়ই বা কেন? ভাবিনি? সৎ-ভাবনা....

—শুনুন।—বিড়বিড় করে উঠলো ডায়না।—এখানে, এই বাড়িতে, পৃথিবীতে যাকে পাপ বলে, তা ছাড়া অন্য কিছু নেই। আপনি যেমন এই বাড়িতে রয়েছেন, আমিও রয়েছি। আপনি যেমন হয়েছেন, আমিও তেমন হয়েছি। যেসব পাপকর্ম, খারাপ কাজ করে ফেলেছেন, তার হাত থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন না। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত তা আপনার সঙ্গেই থাকবে, আমার সঙ্গেও থাকবে। তাকে ঘিরেই আপনাকে ঘোরাফেরা করতে হবে, যেমন আমাকে করতে হচ্ছে। তার প্রভাব আপনি কোনরকমেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতেই হবে, যেমন আমি আছি।

—আপনি ভেবেছিলেন, আমি সক্রোশ ব্যাঙ্কে চলে গেছি।—বলে চলে মেয়েটি।—না। আমি আমার ঘরেই ছিলাম। শুয়ে শুয়ে পড়ছিলার। আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলেন তখনি আপনাম পায়ের শব্দ আমার কানে গিয়েছিল। আমি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিভিয়ে রেখেছিলাম, আপনি দরজায় এসে ধাক্কা দিয়েছেন, ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে পাশের শোবার ঘরে ঢুকলেন, ঘরের ভেতরে থেকে আমি তা সবই বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর বেরিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, ঘরের ভিতর আপনি কি করছিলেন। আপনাকে অমনভাবে চমকে দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত।

ডায়না যে এতগুলো কথা বলে গেল, কেবলমাত্র গুন্‌গুন্‌ শব্দ ছাড়া আর যেন কিছুই কানে গেল না রেণরের। আধ ঘণ্টা আগে ডায়না যা বলেছিল সেটাই যেন বড় বেশী করে বাজছিল তাঁর কানে।

তারই সূত্র ধরে আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন রেণর।—এইমাত্র কি যেন বললে? এই বাড়িটার সম্বন্ধে! পাপী···আমি পাপী....তুমি পাপী ...!

হাসল মেয়েটি।

—ওসব নিয়ে আপনাকে এখন দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না।—মোলায়েম সুর ডায়নার গলায়—অনেক রাত হয়ে গেল। শুয়ে পড়ুন। মনে আছে, কালই আবার তদন্ত আছে।

শোনা মাত্রই আবার যেন একটা আতঙ্ক চেপে ধরল রেণরকে।

—হ্যাঁ, তদন্ত।—একটু থেমে বলেন রেণর।—তুমি কী বলবে? তুমি ত' দেখছি জান যে মহিলা আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। ওর মৃত্যুতে আমার কিন্তু কোন হাত ছিল না। শপথ করে বলতে পারি, আমি ওকে ছুঁইনি পর্যন্ত।

—শপথের প্রয়োজন নেই।—তেমনি শান্ত স্বর ডায়নার।—একমাত্র আপনি নিজে ছাড়া আর কেউ কিন্তু বলছে না যে ওর মৃত্যুতে আপনার হাত আছে। জানালা থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। ব্যাস।—তারপর একটু থেমে যোগ করল—যদিও কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম সে ভুল বালতি নিয়ে সাফাইয়ের কাজ করতে গিয়েছিল।

রেণর আর সরাসরি তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। দারুণভাবে কাঁপতে সুরু করল তাঁর হাত। মুখ ঢাকলেন সেই হাতে। কেন মেয়েটি বারবার ঐ একই কথা শোনাচ্ছে তাকে? কি তার অনুমান? স্পষ্ট করে বলছে না কেন?

—আর নয়। আমি শুতে চললাম আপনিও শুয়ে পড়ুন। গুড্‌ নাইট।

নিঃশব্দে চলে গেল ডায়না। মুখের ভিতর হাত রেখে আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন রেণর। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। চোখের দৃষ্টিটা যেন আবার যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দেখল ঘর ছেড়ে চলে যায়নি মেয়েটি। দাঁড়িয়ে আছে সে টেবিলের কাছে। ঝুঁকে পড়েছে তার সাজিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপির ওপর। দ্রুত পড়ে চলেছে।

—ক্রুদ্ধ গর্জনে যেন চকিতে রেণর লাফিয়ে উঠলেন নিজের পায়ের ওপর। ছুটে গিয়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন তাকে।

না···না তুমি পড়তে পাবে না।—চিৎকার করে ওঠে রেণর। এটা আমার···আমার।

তারপর প্রায় বাচ্ছা ছেলের মত পাণ্ডুলিপিগুলি গুছিয়ে নিজের বগলদাবা করে নিলেন।

সজোরে ডায়নার হাতের যেখানটায় ধাক্কা দিয়েছিলেন রেণর, সেখানটায় হাত বুলোতে বুলোতে কিছুক্ষণ দাঁড়াল ডায়না।

—আপনি আমায় মারলেন?—বলে ডায়না।—আপনি কি লিখেছেন, তা যদি পড়তেই না দেবেন, তাহলে টেবিলের ওপর এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া আপনার উচিত হয়নি।

—নিশ্চয়ই না।—বলেন রেণর।—এখান থেকে যখন উঠে গেছি, তখনো পর্যন্ত জানি এ-বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার ধাক্কায় যদি আঘাত পেয়ে থাক, তো দুঃখিত।

—আপনার ধাক্কাটা খুবই লেগেছে।—আহত হাতে হাত বুলোতে-বুলোতে মেয়েটি রাখে কৌতূহলী প্রশ্ন—এটাই কি আপনার নতুন উপন্যাস?

—না।—মিথ্যা কথা বলেন রেণর।

—তাহলে, এর নাম 'ভৌতিক মহল' রেখেছেন কেন!—জানতে চাইল ডায়না।—নামটা দেখেই মনে হচ্ছে এমনি একটা বাড়ির কাহিনীই লিখছেন? তাই না? সেই রকমই তো মনে হয়। কোন

বাড়ি ? এই বাড়ি নাকি !

—না।—বেশ জোরেই বলে ওঠেন রেণর।—এই বাড়ি নিয়ে গল্প লেখার কি প্রয়োজন আমার।

—কারণ, এই বাড়িতেই গল্প আছে।—জবাবে বলে মেয়েটি।—তবে তা লিখতে গেলে কলমকে লাল রক্তে ডুবিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা চলি। গুড্ নাইট।

এবার ঘর ছেড়ে চলেই গেল ডায়না।

নির্বাক দৃষ্টি মেলে রেণর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারা গমন পথের দিকে। তখনো কাঁপছে তাঁর শরীর। বগল থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। আগুনের পাশে চেয়ারে বসে পড়লেন।

মনে মনে ভাবলেন—কী সাঙ্ঘাতিক রাত ! যেন এক দুঃস্বপ্ন !

মেয়েটার আয়ত্তের মধ্যে তিনি শেষে চলে গেলেন ? এখন পরিষ্কার তাঁর কাছে—হান্নার ব্ল্যাকমেল তাঁর অজানা নয় ; তার মৃত্যু সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার মনে। তানইলে বারবার ঐ ভুল বালতির কথা সে বলত না।

এখন শুধু তদন্ত আসার অপেক্ষা। মেয়েটি নিশ্চয়ই সব কিছু যদি বলে, গ্রেপ্তার হওয়া থেকে কী নিজেকে বাঁচাতে পারবেন ? যদিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মেয়েটি যে সে কিছু বলবে না। মায়ের মৃত্যুতে সে খুশীই হয়েছে। এ কী অদ্ভুত মেয়ে !

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এরপর। তুলে নিলেন পাণ্ডুলিপি। আলো নিভিয়ে উঠে এলেন ওপরে শোবার ঘরে। শেলফে সযত্নে চাবি দিয়ে রাখলেন। তারপর শরীরটা এলিয়ে দিলেন বিছানায়। সারাদিনের ধকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন গভীর ঘুমে।

সকালে ডায়না চা এনে ডাকতে ঘুম ভাঙ্গল।

আজ সকালেই তদন্ত। আবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

ভাবলেন ভালয়-ভালয় ঝামেলাটা মিটে গেলে হয়। অস্বস্তি একটা থেকেকেই গেল মনে। ঠিক সেই সময় কি জানি, মেয়েটি আবার কি বলে বসবে। আচ্ছা, হান্না মোফাতের সঙ্গে ওর আসল পরিচয়টাও কি সে-সময় গোপন করে যাবে?

বেলা এগারোটায় জেরার কাজ সুরু হল। প্রথম সাক্ষী রেণর নিজে। ডাক পড়তেই হাজির হলেন তিনি করোনারের সামনে। তিনি বললেন—প্রায় সাড়ে ন'টা হান্নাকে তিনি জানালা সাফ করতে বলেছিলেন। তারপর ডাইনিং রুমে এসে লেখায় মন দিয়েছিলেন। লিখছিলেন একমনে হঠাৎ এলেন কর্নেল ব্ল্যাকনে আর তাঁর মেয়ে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় গাঁয়ের একটা ছেলের চীৎকার চেঁচামেচি শুনে জানতে পারলেন, জানালা থেকে হান্না চাতালে পড়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে কর্নেলও ছুটলেন। চাতালে গিয়ে দেখেন, ঠিক তাই। ওপরের জানালা খোলা। ঠিক তারই নীচে হান্না পড়ে মারা গেছে।

দ্বিতীয় সাক্ষী ডায়নার ডাক পড়ল। যতই সে এগিয়ে আসতে লাগল, রেণরের বুকে ততই যেন হাতুড়ি পেটার শব্দ উঠতে লাগল। কী বলবে সে?

—দেখলাম, দুর্ঘটনার সময় আপনি বাড়িতে ছিলেন না?—বললেন করোনার।

—না, আমি ফায়ার ফিল্ডে অন্য এক জরুরী কাজে গিয়েছিলাম। —বলে, ডায়না বলল—যখন যাই, পিসি তখন সাফ করার জল-টল নিয়ে ওপরতলায় যাবার তোড়জোড় করছিল। দেখে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

শুনে অবাক দৃষ্টিতে রেণর তাকালেন মেয়েটির দিকে। এ কী বলল! হান্নার মৃত্যু সম্বন্ধে ওর মনে যে সন্দেহ থাকুক, এরকম জবানবন্দী তো যাবে তারই দিকে। হান্না জানালা ধোয়ার জল-টল নিয়ে উঠছিল—এমন ডাহা মিথ্যে কথাটা ডায়না বলল কেন?

রেণর তো জানেন, আসলে তা নয়।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে।—করোনার বললেন ডায়নাকে—আচ্ছা এটা যে নিছক দুর্ঘটনা এ বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত? কোন দিন কি কোন কারণে আপনার পিসির মুখে আত্মহত্যা করার সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন? বা, এমন কিছু কি ঘটেছিল, যাতে পিসি আপনার বাধ্য হয়েছিলেন, নিজের জীবনটাকে এইভাবে শেষ করে দিতে?

—না। সেবকম কোন ব্যাপারই তার জানা নেই।—বেশ জোর দিয়ে বলে ডায়না—মরার ইচ্ছে পিসির মনে কখনো জাগে নি। আজকাল প্রায়ই বলত, মাঝে-মাঝেই মাথাটা তার যেন ঘুরে ওঠে। আমার মনে হয় জানালায় বসে কাজ সাফ করতে গিয়ে সেই রকমই কিছু হয়েছিল। সামলাতে পারে নি।

—এ নিয়ে ডাক্তার দেখান নি, তিনি?—জানতে চাইলেন করোনার।

—না, দেখায় নি। বললে, বলত ও কিছু নয়। ডাক্তার দেখান, ওষুধ খাওয়া, ওসব একেবারেই পছন্দ করত না।

করোনার কয়েক মিনিট নথিপত্রে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—যথেষ্ট ধন্যবাদ।

চলে গেল ডায়না। একবার ফিরেও তাকাল না রেণরের দিকে। রেণর ভাবলেন, নিজের ওপর কী সংযম মেয়েটার!

এর পর করোনারের রায় কী হতে পারে, আর অজানা নয় রেণরের।

আরো কয়েকটা সাক্ষীর জবানবন্দী নেবার পর কারোনার সেই রায়ই দিলেন, মনে মনে রেণর যা ভেবে ছিলেন। হান্না মোফাত দুর্ঘটনাতেই মারা গেছে গৃহস্থালী কাজ করতে গিয়ে। ডায়নাকে কিছু সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেলেন করোনার।

তদন্তের ব্যাপারে হলারটন হল থেকে এসেছেন কর্নেল ব্ল্যাকনে।

তাঁর মেয়ে এডিথই তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আবার এসে নিয়ে যাবে।

করোনার, পুলিশ ডাঃ ম্যাকটাভিস সবাই চলে যেতে রেণর ডাকলেন কর্নেলকে—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—বেশ তো, বলুন।

—আপনি সক্রস ব্যাঙ্কের বব ফারগাসকে চেনেন। আপনারই তো আবার বসিন্দা। তাই না?

—হ্যাঁ।—সম্মতি জানান কর্নেল।—তা কি হয়েছে?

—আমায় কাল মেরেছে।—বললেন রেণর।—আমারই বাড়িতে এসে আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে।

শুনে, কর্নেল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

—আপনাকে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে? কী বলছেন? কেন?

—যেহেতু আমি তাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিলাম—বললেন রেণর।

এখন আর কোন উদ্বেগ নেই, নেই কোন দুশ্চিন্তা। ঝরঝরে হয়ে গেছে অনিশ্চয়তা। সতেজ হয়ে উঠেছে রেণরের মন। বব ফারগাসের ওপর অপমানের প্রতিশোধ নেবার স্পৃহাটা প্রবল হয়ে উঠল মাথার মধ্যে।

নতুন কিছু তিনি করতে যাচ্ছেন না। গত রাত্রে, কাহিনীতে তাঁর কলমের লেখাই হয়ে গেছে। গ্রেলিংসের নায়ক ক্লড রয়স্টন যা যা করেছে তিনি শুধু তাকেই অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছেন মাত্র।

—কী! আপনি তাকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন বলে, সে আপনাকে মেরে বসল? আশ্চর্য।—রেগে আগুন হয়ে উঠলেন কর্নেল।—এরকম তো আমি কখনো শুনি নি। বিশ্বাস করা যায় না। নেশা-টেশা করেছিল না কি?

—না, না। খুব স্বাভাবিক ছিল।—বললেন রেণর।—খুব

শান্ত। তবে আসল ব্যাপারটা বলি আপনাকে। ডায়নাকে বব ভালবাসে, ওতে আমার বলার কিছু নেই। জুটি মানাবেও ভাল। আমার আপত্তি শুধু এই বাড়িতে ওর আচরণে। বুঝতে পারছি পিছনে পিছনে হান্না মোফাতের মদত না থাকলে এতটা হত না। আমার বাড়িটা যেন আমার নয়, ওরই। আমার আমার আগে পর্যন্ত ওরই ব্যবহারে ছিল বোধ হয়। আমি আসার পর থেকে দেখছি, প্রতি রাতেই আসে। তা আসুক। এসে রান্নাঘরে ওদের কাছে থাকুক, আমার কিছু বলার ছিল না। যখন দেখলাম ছোকরা আমার বাথরুম পর্যন্ত ব্যবহার করছে, তখন মনে হল, আপত্তি জানানো উচিত। আমি সেই আপত্তিই জানিয়েছিলাম।

—সে কী?—বিস্মিত হলেন আরও কর্নেল।—আপনি বলছেন, আপনি তাকে আপনার বাথরুম ব্যবহার করতে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, গত রাতেও দেখেছি।—প্রত্যুত্তরে বললেন রেণর।—দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ছিলে? বললে বাথরুমে ছিল। আমি বললাম, এতটা বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না। উত্তরে আমাকে বলল আমি নাকি একটা গোমরামুখো লম্পট। অবাক হলাম, ওর এই অশালীন মন্তব্য শুনে। ওকে বললাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে আর যেন এবাড়িতে না ঢোকে। তখন জানতে চাইল, এবাড়িতে যদি সে ঢুকতে না পায়, ডায়নার সঙ্গে তাহলে তার দেখা হবে কি করে। আমি বললাম, তার আমি কি জানি? প্রত্যুত্তরে তাহলে তার দেখা হবে কি করে। আমি বললাম, তার আমি কি জানি? প্রত্যুত্তর আমায় কি বলল জানেন? বলল—আমার নাকি মেয়েটার দিকে নজর পড়েছে। শুনে, তো মশাই আমার সব রক্ত মাথায় উঠে গেল। বললাম, যদি এক্ষুনি বেরিয়ে না যায়, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। ব্যাস,

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঘুসিতে আমাকে একেবারে চুল্লীর কাছে ফেলে দিল।

—স্কাউণ্ড্রেল!—রাগে গরগর করে উঠলেন কর্নেল।—আমি জানি রেগে গেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না। এও জানি মাঝে-মধ্যে নেশাও করে। কিন্তু এরকম আচরণের কথা তো আগে কখনো শুনি নি। আপনি ঠিক তো যে ও তখন একটুও নেশা করেনি?

একটু ইতস্ততঃ করলেন রেণর।

—দেখে তো আমার তাই মনে হল।—বললেন তারপর। —নেশার চেয়ে দেখলাম ওর মনে ঈর্ষাটাই দারুণ। বুঝতে পারলাম না কেন। মেয়েটা আমার চাকরাণী এর বেশী তো কিছু নয়।

—ঠিক···ঠিক। ঠিক কথা বলেছেন। ঈর্ষা ভদ্রলোকের ভদ্রতাই ভুলিয়ে দেও। নেশার চেয়েও মারাত্মক। ফারগাসের মত ছোকরার পক্ষে এ তো খুবই স্বাভাবিক। থাকগে, এখন কি করতে চান বলুন। পুলিশে দেবেন?

—না···না।—রেণর তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন।—ও আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনাকে বললাম, কারণ আপনার মহলেরই অধিবাসী, আপনারই ভাড়াটিয়া। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন, যেন এখানে না আসে, অশান্তি না করে।

—নিশ্চয়ই। এ তো খুব ভাল কথা। অবশ্যই বলব।

—আর, আমার কাছ থেকে যেন ক্ষমা চেয়ে যায়।

—অবশ্যই।—প্রতিশ্রুতি দিলেন কর্নেল।

রেণরের কানে এসে বাজল একটা গাড়ি আসার শব্দ। অনুমান করে নিলেন, নিশ্চয়ই এডিথ আসছে গাড়ি নিয়ে বাবাকে নিতে। পরিকল্পনা মত কাজ করতে হবে। মনে-মনে সব ভেঁজে ঠিক করে নিলেন আবার রেণর।

—ফারগাসের কাছ থেকে লিখিত কোন কিছুর দরকার নেই।—

বললেন রেণর।—মুখেই যথেষ্ট। আমার বাড়িতে এসে ক্ষমা চেয়ে যাক, তাও চাইনা। বোধ হয়, আমরা দুজন একসঙ্গে ওর কাছে গেলে, ভালই হবে। কি বলেন? সক্রোশ ব্যাঙ্কে এখন যেতে কি আপনার অসুবিধে হবে?

—না। কিসের অসুবিধে? এ তো ভাল প্রস্তাব—খুব ভাল প্রস্তাব। লোহা গরম থাকতে থাকতে তাকে আঘাত হানাই ভালো—বলে, ঘড়ির দিকে তাকালেন কর্নেল। তারপব বললেন—এখন বেরোলে ঠিক ওর খাবার সময়ই ওকে ধরতে পারব।

গাড়ি নিয়ে ইতিমধ্যে এডিথ এসে গেছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন—এডিথ, মি. রেণর আর আমাকে একবার সক্রস ব্যাঙ্কে ফারগাসের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।—রেণরের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললে এডিথ।

—সেই টুইডেব পোশাক পডনে এডিথের। দেখতে বেশ দেখাচ্ছে তাকে।

সকলেই উঠে বসল গাড়িতে। ছুটতে সুরু করল গাড়ি।

॥ পনের ॥

রেণর আর তার বাবাকে নিয়ে এডিথের গাড়ি খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেল সক্রস ব্যাঙ্কে। ক্রম ম্যানর থেকে আড়াই মাইল পথ।

গাড়ি দাঁড়াল একটা খামার বাড়ির সামনে।

নামতে নামতে কর্নেল বললেন—বেশী দেরী হবে না, এডিথ। একটু দাঁড়াও।

বাড়িতে পা দিতেই সামনে দরজা। বেল বাজালেন কর্নেল। পিছনে রেণর। সজাগ দৃষ্টি তাঁর।

দরজা খুলে মুখ বাড়াল প্রায় চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে। লাজুক মুখ। সামনে দুজনকে দেখে আরও যেন একটু কুঁকড়ে গেল।

—এই যে অ্যানি, দাদা আছে?—বেঁটে-খাটো কর্নেলের গম্ভীর গলা।

—হ্যাঁ স্যার। খাচ্ছে।

—বল গিয়ে, আমি এসেছি।

লাজুক অ্যানি তখনি দৌড়ে গিয়ে ডেকে দিল। মিনিট পরেই দরজা বরাবর বারান্দা পথে দেখা গেল ফারগাসকে আসতে। আঁট-সাঁট পোশাক, পায়ের বুটে একগাদা কাদা। পিছনে রেণরকে দেখেই মুখ তার কঠিন হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে গেল। কর্নেল ব্ল্যাকনে-র তা নজর এড়াল না।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে ফারগাস।—সরাসরি বললেন কর্নেল।

—বলুন।

কর্নেলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ফারগাস সব সময়ই তাঁকে তাঁর সম্মানসূচক 'স্যার' বলত। এই মুহূর্তে সে আর তা বলল না।

—এখনে নয়। ভিতরে। আমি যখন কথা বলতে এসেছি ফারগাস, নিশ্চয়ই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলব না।

—একটু ইতস্ততঃ করল ফারগাস। তারপর যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের নিয়ে গিয়ে বসাল বড় এক বসবার ঘরে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরের অনেকখানি।

ফারগাস আর কর্নেলকে অনুসবণ করতে করতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল রেণরের চোখ। ঘরখানা দেখেই মনে হল রেণরের যে কাজের পর সন্ধ্যায় এখানে বেশ আসর বসে। আগুনের অপেক্ষায় চুল্লী। খানকয় ম্যাগাজিন, দু-একটা খবরের কাগজ পড়ে ঘোড়ামুখ সোফার এখানে ওখানে। সবচেয়ে রেণরের নজরে যা পড়ল—একটা ছিপ. একজোড়া সারস-জাতের পাখি, দোনলা একটা বন্দুক ঘরের

কোনে। নীচেয় ছোট্ট একটা শেলফ্। তাতে খানকয় বই, আর একটা চৌকো কার্ডবোর্ডের বাক্স। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইতিমধ্যে রেণর সবই দেখে নিলেন।

—এখন শোন ফারগাস—কোন ভূমিকা না করে বললেন কর্নেল—আমি বুঝতে পারছি, গতকাল রাতে তুমি মিঃ রেণরকে যে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়ে এসেছ, তা ভুলে গেছ।

—হ্যাঁ মেরেছি, ঠিক করেছি।—বলে উঠল ফারগাস।—ভুলি নি। ভুলব কেন? ও< যা প্রাপ্য ছিল, তাই পেয়েছে।

—থামো।—ধমকে উঠলেন কর্নেল।—আমার সঙ্গে কথা বলছ, ভুলে যেও না। মি. রেণর এখানে নতুন এসেছেন, আমাদের প্রতিবেশী, আমার বন্ধু। তুমি বা তোমার মত কারো কাছে উনি অপদস্ত হবেন, আমি চাই না। তোমার ভাগ্য ভালো যে উনি তোমাকে তার জন্যে পুলিশে দেন নি। যাইহোক, আমি এখানে এসেছি. তোমাকে সাবধান করে দিত—তুমি এরপর ঐ ক্রুম ম্যানরে আর যেতে পারবে না আর আমি চাই তুমি যা করেছ তার জন্যে মি. রেণরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

—কি বললেন? ক্ষমা?—রাগে ঘঁৎ ঘঁৎ করে উঠল ফারগাস।—আমি কি ওকে ঝুটমুট মেরেছি? ও কী আপনাকে তাই বলেছে?

—হ্যাঁ ঠিক তাই।—তেমনি ভাবেই বললেন কর্নেল—ওঁর বাড়ি। তুমি যথেচ্ছভাবে ওঁর বাড়ির সব কিছু ব্যবহার করবে, এতবড় ঔদ্ধত্য তোমার? তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলে মি রেণর কোন অন্যায় করেন নি।

—ঠিক করেছে? আমার ভাবী স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে ও ঠিক করেছে? তাকে একা পেয়ে, তার গায়ে হাত তুলবে···সে সাহায্যের জন্যে চেঁচাবে, আর আমি সেখানে থেকেও চুপ করে থাকব···বাঃ। —বলতে বলতে কঠিন হয়ে ওঠে আবার ফারগাসের মুখ, হাত হয়ে যায় মুষ্টিবদ্ধ।—আমি শুধু তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, তাই না?

বেশ করেছি, মেরেছি। আবার মারব, যদি আবার ও আমার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

—নাঃ, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।—কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন রেণর—আগেই বলিনি আপনাকে,...পাগল। ওকে বরং সাবধান করে দি ্, আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ যদি বারবার ও আনে, তাহলে আমার সম্মান বাঁচানোর জন্যে বাধ্য হব, আদালতের আশ্রয় নিতে। চলুন, বাইরে কথা হবে।

—কী সব বলছ ফারগাস?—চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল কর্নেলের—দেখছি, রেণর ঠিকই বলেছেন।....পাগল?

—না, পাগল আমি নই।—গরগর করে ওঠে ফারগাস।—যা বলছি, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়।

মুখ ফিরিয়ে তখন বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছেন রেণর। যেন হাওয়ায় উড়ে এসে ধরল সে রেণরের হাত। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জে উঠল—সত্যি কথা বল শয়তান। নইলে ঘাড় মুচড়ে শেষ করে দেব।

—থাম।—হুঙ্কার ছাড়লেন কর্নেল। রাগে কান-মাথা তাঁর ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল।—মি. রেণরের কাঁধ থেকে হাত নামাও....হাত নামাও। আর শোন, এখানে তোমার থাকা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে বিদেয় হয়ে তোমার ডেরা, তুমি দেখে নাও।

হাত নামিয়ে নিল ফারগাস। ঝকঝক করে উঠল তার চোখ দুটো।

—হ্যাঁ চলেই যাব।—চেঁচিয়েই বলল সে।—এখানে আর থাকব না, বললেও না। দেখতে পাচ্ছি দুজনেই এখন এক। কিছু মনে করবেন না, একদিন এর প্রতিফল আপনাদের পেতে হবে। বেরিয়ে যান এখান থেকে এখনি যান।

রেণর ছাড়া পেয়ে আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন। রাগে গরগর

করতে করতে এবার কর্নেলও বেরিয়ে এলেন। এগিয়ে চললেন গাড়ির দিকে।

—শূয়োর! বুনো শূয়োর!

—আমার মনে হয়, মাথায় ওর নিশ্চয়ই গোলমাল আছে।—মন্তব্য করলেন রেণর।

গাড়ির কাছে পৌঁছোতেই প্রশ্ন করে এডিথ—

—কী হচ্ছিল ওখানে? যেন একটা দাঙ্গা! ফারগাসই যেন বড় বেশী চেঁচামেচি করছিল?

—হ্যাঁ।—বললেন কর্নেল।—আমার খামারবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে এলাম ওকে। চল, বাড়ি ফেরা যাক। মিঃ রেণর দুপুরে আমাদের ওখানেই খাবেন।

—অশেষ ধন্যবাদ। মাপ করবেন। আজ দুপুরে আপনাকে সঙ্গ দিতে পারছি না।—চলন্ত গাড়িতে বললেন রেণর।—জরুরী কিছু কেনা-কাটার আছে। বিকেলেই নিউ ক্যাসেল যেতে হবে।

—সে তো বিকেলে;—বললেন কর্নেল।—দুপুরের আহারাদি সেরে নিন। বিকেলে এডিথই আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবেখন।

তাই হল। গাড়ির আসনে পিছনে এলিয়ে বসলেন রেণর। মুচকি হাসলেন। না, একচুল ও এখনও এদিক-ওদিক হয় নি—তাঁর উপন্যাসের নায়ক ক্লড রয়সটনের পরিকল্পনামাফিক কাজ ঠিকই চলছে।

তাঁর পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ছিল, বর্বর বব ফারগাসকে ওর ডেরা থেকে তাড়ানো। তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় আজ বিকেলে নিউ ক্যাসেলে। আর শেষটা আজই রাতে।

॥ ষোল ॥

এই প্রথম মি. রেণর এলেন হলারটন হলে। বেশ মনোরম পরিবেশ। দুপাশে সারিবদ্ধ গাছ। নুড়ি পাথর বিছানো চওড়া পথ। বাহারে লতা-পাতায় সাজানো কাটা—তরমুজ রঙ ইঁটের বাড়ি—বিশাল, কর্নেল ব্ল্যাকনের হলারটন হল। বেশ একটা ঘরোয়া-ঘরোয়া শান্ত পরিবেশ। মনে হল রেণরের তাঁর পাথুরে ক্রুম ম্যানর থেকে অনেক—অনেক পার্থক্য এই মহলের।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো দেউড়ীর সামনে। নামলেন গাড়ি থেকে। ঢুকলেন বাড়িতে। বাড়িটা দেখে নিজের খুশি-খুশি ভাব এমন ভাবে প্রকাশ করলেন যে কর্নেল সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে অন্দর মহল থেকে সব মহলটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘুরে-ঘুরে মহলটা খুঁটিয়ে দেখার মধ্যে রেণরের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, স্বপ্নেও সে চিন্তা জাগে নি কর্নেলের মনে। প্রায় একশ' বছর ধরে পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছেন এই মহলে রেণর। অতিথিকে সব দেখানোর মধ্যে তাই মনে মনে বেশ তৃপ্তিই অনুভব করছিলেন।

রেণরের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু অন্য। বব ফারগাসের ওপর প্রতিশোধ নেবার যে খসড়া পরিকল্পনা করেছিল তাঁর নায়ক রয়স্টন, তারই জন্যে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল তাঁর।

অকৃতদার কর্নেল। মেয়ে এডিথ ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই।

খাবার যা এল, যেমন ভালো. তেমনি অঢেল। কিন্তু ঠিক ভাল লাগল না রেণরের।

খামার বাড়ির উত্তেজনা আর নেই। তার জায়গায় একটা ভয় ভয় ভাব রেণরের মনের কোণে উঁকি দিতে সুরু করেছে। ক্রুম ম্যানর থেকে বেরিয়ে নির্জন প্রান্তরে বেড়াতে বেরিয়ে যে ভয় ভয়

ভাবটা সেদিন জেগেছিল, ঠিক সেই রকম।

ভাবতে অবাক লাগে রেণরের। ঐ মহল থেকে বাইরে বের হলেই দেখেন, মনে জাগে এই ভাব,—যা কিছু অপকর্ম করেছেন, তার জন্যে একটা আতঙ্ক। অথচ, মহলের ভিতর থাকলে!

আবার অনুভব করলেন রেণর, সেই নিষিদ্ধ মহল কী রহস্য-জনকভাবে তাঁর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। আপ্রাণ চেষ্টা নিলেন, মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে। তাঁর অন্যমনস্কতা এঁদের কোন মতেই বুঝতে দিলে চলবে না। নিজে তিনি ভালই বাকপটু। তাই কথাবার্তার মধ্যেই চেষ্টা করলেন নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে।

খাওয়া মিটে গেলে এডিথই গাড়ি করে রেণরকে নিয়ে গেল নিউ ক্যাসেলে। ভিতরে-ভিতরে অশান্তিতে ক্ষত বিক্ষত হলেও বাইরে তিনি কাউকেই তা বুঝতে দিলেন না। গ্রেট নর্থ রোড ধরে গাড়ি চলেছে নিউ ক্যাসেলের দিকে। এডিথের সঙ্গে সমানে, বক্‌বক করে গেলেন রেণর। যদি মেয়েটি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে তিনি নিজেই খুশী… !

টাইন সাইডের ধূসর শহরে পৌঁছে রেণর কিছুক্ষণের জন্যে সরে গেলেন এডিথের কাছ থেকে। বলে গেলেন, তাঁকে একবার তাঁর পিসির আইনজ্ঞ গ্রিমস্‌ এণ্ড গ্রিমেটের, গ্রিমেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দরকার আছে। ঘণ্টাখানক লাগবে। এডিথ যেন নরদামবার-ল্যাণ্ডের রোডে স্টনউইক্‌সের চায়ের দোকানে অপেক্ষা করে।

রেণর কিন্তু ওদিকে পা ও বাড়ালেন না। বরং খুঁজতে বেরোলেন কোথায় ভাল পোশাকের দোকান আছে। অনেক খোঁজার পর গ্রেনার স্ট্রীটে দেখতে পেলেন একটা বড় ভাল দোকান। ভিতরে ঢুকলেন। কিছু কেনা-কাটা করলেন। সময় লেগে গেল প্রায় এক ঘণ্টার ওপর।

এল্‌ডন স্কোয়ারে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল এডিথ। রেণর

প্যাকেট এনে তুললেন গাড়িতে। এলেন স্টনউইক্সের চায়ের দোকানে।

মনে তাঁর তখনো সেই ভয়ের হানা, অবসাদ। চায়ের দোকানের দিকে যেতে যেতে কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল—তিনি অসামাজিক, খুনী। এইভাবে সভ্য সমাজে মেশার কোন অধিকার নেই তাঁর। সব সময়ই একসূঁচ যেন বিঁধে চলেছে তাঁকে।

নিজেকে তিনি বারবার বোঝাতে লাগলেন, যা কিনেছেন, তা তো তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যে নয়। বব ফারগাসের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তিনি কিনতে বাধ্য হয়েছেন। এ যে তাঁর উপন্যাসের নায়ক রয়সটনের পরিকল্পনারই একটা অংশ। তিনি কী করবেন?

চায়ের দোকানে কথার গুঞ্জন, অর্কেস্ট্রা কিছুই পারল না তাঁর মন থেকে অবসাদ দূর করতে। তবুও আপ্রাণ চেষ্টায় মুখে ফুটিয়ে রাখলেন খুশি-খুশি ভাব।

দোকান থেকে বেরিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল, এডিথের গাড়ি এসে দাঁড়াল ক্রম ম্যানরের সামনে।

প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন রেণর।

—অশেষ ধন্যবাদ।—এডিথকে বললেন রেণর।—বিকেলটা ভারী সুন্দর কাটল। এখন হালারটন হল আমার জানা হয়ে গেল। যদি পারি, আবার একদিন যাব।

—নিশ্চয়ই আসবেন।—বন্ধুর মত হেসে বলল এডিথ।—যখনই মন চাইবে, চলে আসবেন। খুব ভাল লাগবে।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল এডিথ। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখলেন রেণর, রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল গাড়ির পিছনের লাল আলো।

মনে মনে বললেন রেণর—হ্যাঁ, হলারটন হলে অবশ্যই তিনি যাবেন। আর যাবেন, আজই রাতে যা কর্নেল বা এডিথ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে রেণর। মাথায় চিন্তার তরঙ্গ। অপরাধের তালিকায় আর একটা অপরাধ যুক্ত হতে চলেছে। আগের দুটোর তুলনায় এটা আরও মারাত্মক, আরও সাঙ্ঘাতিক, আরো জঘন্য।

মনে মনে একবার কেঁপে উঠলেন রেণর। আচ্ছা, কোনরকমেই কী জঘন্য কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা যায় না? যায়··· নিশ্চয়ই যায়···। না, এমন কাজ কিছুতেই তিনি করতে পারবেন না। এভাবে চলে না।

বুঝতে পারলেন বন্ধ দরজা খুলে গেল। বাতির হলুদ আলো এসে পড়ল বাইরে। দরজায় এসে দাঁড়াল ডায়না।

—গাড়ির শব্দ পেলাম।—বলল ডায়না।—ভাবলাম নিশ্চয় আপনিই এলেন।

কোন কথা না বলেই রেণর ঢুকে গেলেন বাড়ির ভিতর। দরজা বন্ধ করে দিল ডায়না।

॥ সতের ॥

সোজা শোবার ঘরে গিয়ে প্যাকেটটা ওয়ারড্রোবে রেখে চাবি দিয়ে, চাবিটা পকেটে পুরে নিলেন। ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে নেমে এলেন ডাইনিং রুমে। তুলে নিলেন এক পাত্র মদ।

মদ খাওয়াটা এখন যেন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মদ খাওয়ার পিছনে যদি কোন কারণ থাকে, তা অবশ্যই রেণরের ছিল।

এখন মনের ভেতর বাইরের সেই ভয় ভয় ভাব, অবসাদ কিছুমাত্র নেই।

সত্যিই অবাক লাগে রেণরের, বাড়ির বাইরে বের হলেই একটা ভয়, আতঙ্ক যেন পিছনে-পিছনে দারুণ হানা দিয়ে ফেরে। আর যখনই বাড়িতে ঢুকে এই শান্ত, নিরালা ঘরটিতে বসেন, সবকিছু

কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। মনে হয়, একটা সহৃদয় হাতের স্পর্শ যেন তার সব আশঙ্কা মুহূর্তে নির্মূল করে দিল।

হ্যাঁ, এই ঘর···এই ঘরটার মধ্যে কী যেন এক যাদু আছে। ঘরের বাতাসে যেন সহানুভূতির উত্তাপ, যেন বড় আপনার—নিঃশঙ্ক, নির্ভয় ঘর।

কেন তিনি এই ঘর ছেড়ে বাইরে যান। রেণরের মন যেন গুণগুণ করে ওঠে—বাইরে যাবার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন পড়ে? যেখানে বসে থাকলেই এত শান্তি, এত মানসিক প্রশান্তি। রেণরের মনে এক আজব চিন্তা চকিতে খেলে গেল—এই ঘরটা ছেড়ে বাইরে বের হওয়ার জন্যে কি ঘর এই ভাবে হিংসুক প্রতিশোধ নেয়?

নিজের মনেই এবার হাসলেন রেণর। এসব আবার কী ভাবনা? তবে ব্যাপারটা যে প্রায় সত্যি, তা তো অস্বীকার করার নেই। এখন অনেক সংযত রেণর। ধীরে ধীরে আবার মনে তার জেগে ওঠে আরণ্যক ভাব। আর কয়েক ঘণ্টা। তারপর···বব ফারগাস···!

মিনিট কয় পরেই ডায়না এল।

—সকাল এগারটায় অন্ত্যেষ্ঠি হবে।—বলল ডায়না,—আপনি আসবেন?

একটু ইতস্তত করলেন রেণর। আদৌ ইচ্ছে ছিল না হান্না মোফাতের অন্তেষ্ঠিতে যোগ দেবার। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই, কথা উঠবে। যদিও এখন তিনি ওসব আর গ্রাহ্যই করেন না। তবুও, আজে-বাজে মন্তব্য এড়িয়ে চলাই ভাল।

—হ্যাঁ, আসব।—বললেন রেণর।

—শোক জানাবার মত আমরা মাত্র দুজনই আছি।—বলল মেয়েটি।

—মায়ের সঙ্গে গাঁয়ের তেমন সুবাদ নেই। মিশতেন না তো কারো সঙ্গে।—বলল মেয়েটি।—তবে দেখবার জন্যে অনেকেই জুটবে।

চলে গেল সে। বেবাক চোখ মেলে রেণর চুল্লীর জ্বলন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে রাতের পরিকল্পনায় ডুবে গেলেন।

মাঝরাত। সজাগ হয়ে উঠলেন রেণর। ডায়না এই সময় নিশ্চয়ই তার বিছানায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে তাক থেকে বেশ একপাত্র মদ নিয়ে গলায় ঢেলে দিলেন। মনে-মনেই বললেন, কব্জির জন্যে একটা পট্টির দরকার।

বাতিটা নিভিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। অন্ধকার। পিছন দরজায় চাবি। চাবিও ভিতরে।

যাক্ ডায়না তাহলে শোবার ঘরেই গেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে রেণর উঠে এলেন নিজের শোবার ঘরে। দরজা ভিতব থেকে চেপে বন্ধ করে দিয়ে বাতি জ্বালালেন। তারপর ওয়ারড্রোব খুলে নিউ ক্যাসেল থেকে কিনে আনা প্যাকেটটা বের করে বিছানার ওপর রেখে খুললেন। একটা ইলেকৃট্রিক টর্চ, একজোড়া গারটার, একজোড়া চোগা, একটা টুপি, ম্যাকিনটস বর্ষাতি, একজোড়া খেলোয়ার জ্যাকেট, যার একটার তুলনায় অপরটা বেশ বড়।

নিজের পরণের পোশাক খুলে সেই জ্যাকেট দুটোই পড়ে নিলেন, এঁটে নিলেন গারটার। তারপর মাথার ওপর টু'পিটা রেখে প্রায় ঢেকে নিলেন চোখটা। কাঁধ-দুটো এখন বেশ চওড়া দেখাচ্ছে তাঁর। আকৃতিতে অনেকটা বদলে গেছেন। খুশি মন।

পকেটে টর্চ, রুমাল, একজোড়া দস্তানা, চাবিগুলো আর একটা ছুরি ভরে নিয়ে আলোটা নিভিয়ে সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুললেন। বেরিয়ে একবার কান পেতে শুনে নিলেন চারদিক। না, কোথাও কোন শব্দ নেই, নড়া-চড়া নেই। নিশ্চুপ...থমথমে।

শোবার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে চাবি লাগিয়ে, রেণর চাবিটা ভরে নিলেন নিজের পকেটে। তারপর পায়-পায়ে নীচুতলায় নেমে অন্ধকারের মধ্যে চলে এলেন পিছন দরজায়। দরজা খুলে

বাইরে বেরিয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে সে-চাবিটাও রাখলেন নিজের পকেটে। এরপর ডায়নার সাইকেলটা নিয়ে পিছন দিক থেকে এলেন সদর দরজার সামনে।

দেউড়ির গেটে একটু'খন দাঁড়িয়ে সাইকেলের আলোটা জ্বালিয়ে নিয়ে উঠে বসে নির্ভয়ে অন্ধকার ভেদ করে ছুটলেন সক্রোস ব্যাঙ্কের দিকে।

পথে জানা-অজানা কোন লোক, হয়ত বা রোঁদে বেরিয়েছে কনস্টেবল পোজারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাতে কিছুই যায়-আসে না। বরং রেণরের এই মুহূর্তে সেই রকমই কাম্য। পোশাক-আশাক থেকে মাথার টুপিটা পর্যন্ত এই অন্ধকারে দেখলে কেউ বব ফারগাস ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারবে না।

জোরে চলেছেন রেণর। আমরাও, তা আস্তে চালানর কোন প্রয়োজনই নেই। যদি দেখা হয়ে যায় কারো সঙ্গে একটু অস্ফুট 'গুড্ নাইট' করলেই হবে। কেউ এই অন্ধকারে খুঁটিয়ে দেখতেও যাবে না যে মেয়েদের সাইকেলে চড়েছেন তিনি। আসলে এ তল্লাটের সকলেই জানে বব ফারগাসের সঙ্গে ডায়নার কি সম্পর্ক। এই রাতে বব ফারগাসের একা ফিরে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

রেণর তো মনে-মনে চান, কেউ তাঁকে দেখুক। সেইজন্যে আলোটা নেভান নি। আসল উদ্দেশ্য তো নিজের কাছে। যদি কেউ এই সময় বব ফারগাসকে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে, সেটা তাঁর পক্ষে সুবিধেই হবে।

খামার বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে সাইকেল থেকে নামলেন রেণর। আলোটা নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই সজাগ হয়ে উঠলেন। খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। জানা হয়ে হয়ে গেছে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ কাটাবার পরই অপরাধ-বোধটা জেগে উঠবে। পরিকল্পনা-মাফিক কাজটা আর

শেষ করা যাবে না।

না আশপাশে কেউ নেই। আবার সাইকেলে উঠে অন্ধকারেই দ্রুত এসে নামলেন খামারবাড়িতে।

গেটে ঝোপের পাশে সাইকেলটা রেখে, হাতে দস্তানা দুটো গলিয়ে নিলেন। তারপর সাবধানে এগিয়ে এলেন খামার বাড়ির দিকে। খুব সাবধানে, খুব সন্তর্পনে, যাতে একটা কুকুরের কানেও পদশব্দ না যায়।

আজই সকালে কর্নেলের সঙ্গে তিনি যখন ববের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন, তখন ঘরের যে জানালা দুটোর মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন, রেণর লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন, তারই একটার সামনে। আশা করেছিলেন, এর কোন না কোন একটায় হয়ত ভিতর থেকে ছিটকানি দেওয়া থাকবে না।

কিন্তু ধারণা ঠিক না হলেও নিরাশ হলেন না। প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। ছুরি বের করে সাবধানে ছিটকানি খুলে জানলার পর্দায় ব্লেড চালিয়ে দিলেন।

ছুরিটা আবার পকেটে ফেলে অন্ধকারে আর একবার চারদিক দেখে নিলেন। তারপর জানালার পর্দা সরিয়ে নিঃশব্দে এসে ঢুকলেন ঘরে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, দম বন্ধ করে কান খাড়া করে শুনে নিলেন একবার চারদিকটা। ঘড়ির টিকটিক শব্দ আর কোথায় নাক-ডাকার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

পকেট থেকে ইলেকট্রিক টর্চটা বের করে জ্বেলে ধরলেন। সোনালী আলোয় তাঁর দেখা হয়ে গেল ঘরের কোথায় কি আছে। নিভিয়ে দিলেন টর্চ। ঘরের যে কোনে সকালে ছিপ সারস আর দোনলা বন্দুক দেখে গিয়েছিলেন, চুপি-চুপি এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

কোনে গিয়ে হাত তুললেন শেলফে। শক্ত মুঠোয় ধরলেন সেই চারচৌকো কার্ডবোর্ড বাক্সটাকে, সকালে যেটা দেখে গিয়েছিলেন।

চট করে টর্চ জ্বেলে একবার দেখে নিলেন, বাক্সটায় রয়েছে কতকগুলো কার্তুজ। এই অনুমানটাই অবশ্য তিনি করেছিলেন। চট চট চারটে কার্তুজ ভরে নিলেন নিজের পকেটে। বাক্সটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে আবার এগিয়ে গেলেন জানালার কাছে।

আগুন চুল্লীতে খোঁচা দেবার লোহার শিক হলেও চলত। আসলে প্রয়োজন ছিল বব ফারগাসের কোন একটা হাতিয়ারের নিদর্শন। সকালের বন্দুকটা দেখে, আর সেটা পেয়ে খুবই ভাল হল। লোহার শিক থেকে অনেক-অনেকগুণ ভাল হল। বন্দুকটা কার? বব ফারগাসের। অন্য কারো নয়ত? না—নিশ্চয় না।

খুশি মনে ক্লাইভ রেণর আবার জানালা টপকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। গেটের পাশে ঝোপের গায়ে লাগানো সাইকেলটা সোজা করে নিয়ে অন্ধকারে নিঃশ্বাস চেপে সাইকেল চেপে দ্রুত পাড়ি জমালেন।

॥ আঠেরো ॥

বন্দুকটা নিয়ে সাইকেলে চেপে সেই অন্ধকারে আলো না জ্বেলেই ক্লাইভ রেণর দ্রুত ছুটলেন হলারটন হলের পথে। কেউ দেখতে পেল কি পেল না, কোনদিকে পরোয়া নেই তাঁর।

নির্জন পথ। কারো সঙ্গেই মোলাকাৎ হল না। একাই অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেলেন হলারটন হলের গেটের সামনে।

সাইকেল থেকে নেমে, গেটে ভিতরেই একগুচ্ছ ঝোপের পাশে ঠেকিয়ে রাখলেন সাইকেলটা। তারপর নুড়ি-পথের যে পাশটা ঘাসে ঢেকে গিয়েছিল, তার ওপর দিয়েই দেউড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন নিঃশব্দে।

খুব কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারের ভিতর আর

একতাল অন্ধকার যেন বাড়িটা।

বাড়ির সামনে কোন জানালা দিয়েই আসছে না কোন আলো। নিশ্চিন্ত রেণর—বাসিন্দারা সব নিশ্চিন্ত বিছানায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন বাড়ির পিছনে।

কর্নেল ব্ল্যাকনে আজ সকালে যখন তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহলটা দেখিয়েছিলেন, তখনই রেণর ভালভাবে দেখে নিয়েছিলেন যে পিছন দিকের জানলার ছিটকানিগুলো সব সেকেলে, সক্রোশ ব্যাঙ্কের মত।

হাতে বন্দুকটা নিয়ে একটু ঘুরে দেখে নিলেন, যদি কোন জানালার ছিটকানি না থাকে। না, বৃথা। সবকটাই ভিতর থেকে বন্ধ। শেষে রান্নাঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ছুরিটা বের করলেন।

হাতে তখনো দস্তানা। ছুরি দিয়ে পর্দা কেটে ছিটকানি খুলে ফেললেন। তারপর ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে। কান খাড়া করে শুনে নিলেন একবার, কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে কি না। না, আস্তে আস্তে জানালার পর্দাটা নামিয়ে দিলেন কিন্তু একেবারে বন্ধ না করে নীচে থেকে একটু ফাঁক করে রাখলেন।

পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বেলে ধরলেন খুব তাড়াতাড়ি একবার রান্নাঘরের কড়ি-বরগার দিকে। দেখে নিয়ে নামালেন আলো মেঝেয়। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে একজোড়া কার্তুজ ভরে নিলেন বন্দুকে।

কার্তুজ-ভর্তি দোনলা বন্দুক নিয়ে টানটান হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে বন্দুকটা ঠেকিয়ে রাখলেন টেবিলে। পকেট থেকে রুমাল বের করে এমনভাবে মুখের নীচু অংশ বেঁধে নিলেন যে চোখ দুটো ছাড়া আর কিছু দেখার উপায় রইল না। চোখের ওপরে আরো বেশী করে টেনে নিলেন টুপিটা। তারপর বন্দুকটা তুলে নিলেন। নিভিয়ে দিলেন টর্চটা।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কালির মত কালো অন্ধকারে ঢাকা বারান্দা পথ ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন হলঘরের দরজার দিকে। টুক করে আলোটা একবার জ্বেলে নিয়ে দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লেন হলঘরে। কান খাড়া করে নিশ্চুপ দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ।

কয়েক হাত দূরেই আসল সিঁড়ি। দেওয়াল ঘড়ির টিক-টক, টিক-টক শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন বারান্দায়। জ্বাললেন টর্চ। ক্ষণিকের সেই সোনালী আলোয় রেণরের দেখা হয়ে গেল পাশাপাশি দুটো শোবার ঘর। প্রথমটা এডিথের দ্বিতীয়টা কর্নেল ব্ল্যাকনের। আজ সকালেই রেণর খুঁটিয়ে সবই দেখে গিয়েছিলেন।

মাংসপেশী টান-টান হয়ে উঠল রেণরের। টর্চটা নিভিয়ে বর্ষাতির পকেটে ফেলে সাবধানে এগিয়ে চললেন তিনি। এডিথের শোবার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতলেন।

কোন শব্দ নেই। এডিথ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্ত রেণর এগিয়ে গেলেন কর্নেলের ঘরের দিকে।

সেই অন্ধকারে সন্তর্পণে মুঠোর মধ্যে ধরলেন কর্নেলের বন্ধ ঘরের দরজার হাতল। সেকেণ্ডের মধ্যে নিঃশব্দে সে ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন। ধীরে ধীরে দরজাটা একটু ফাঁক করতেই কানে এল নাসিকা গর্জন।

টুক করে ঢুকে আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। ঘরে ঢুকেই পাশে আলোর সুইচ। জানাই ছিল রেণরের। সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠল আলো—ঘরে যেন আলোর বন্যা।

চোখ দুটো হিংস্র এখন রেণরের। বালিশে মাথা রেখে কর্নেল ব্ল্যাকনে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। একমাথা সাদা চুল।

হিংস্র শ্বাপদের মত বন্দুক হাতে ধীর পায়ে একটু একটু করে রেণর এগিয়ে চলেছেন ঘুমন্ত কর্নেলের বিছানার দিকে। নরম কার্পেটে কোন শব্দ নেই।

খুবই কাছাকাছি। হঠাৎ যেন বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন চুপ করে। দেখলেন নড়ে চড়ে উঠলেন কর্নেল। তারপর ঘরের আলোর জন্যেই পিট পিট করে খুলতে সুরু করলেন ঘুম জড়ানো চোখ।

চোখ খুলেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেখানে ছিলেন সেখানেই পড়ে রইলেন।

প্রথমটা হয়ত ভাবার চেষ্টা করলেন ঘরে আলো জ্বললো কিভাবে? তিনি তো জ্বেলে রেখে শোন নি।

কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঠতেই যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। মাত্র কয়েক হাত দূরে মুখোশ-আঁটা ম্যাকিনটশ গায়ে হিংস্র-চোখ আততায়ী।

॥ উনিশ ॥

কর্নেলের মনে সেই চরম মুহূর্তে কী চিন্তা খেলে গিয়েছিল, কেউ জানেনা। টুপি, ম্যাকিনটশ গারটার—পরণে যা কিছু সবই তো সক্রস ব্যাঙ্কের ফারগাসের। এমন কি বন্দুকটাও। তবুও হয়ত কর্নেল কিছু একটা অনুমান করেছিলেন। কিন্তু কিছু বলার আগেই রেণরের নরঘাতী হাতে বন্দুক গর্জে উঠল। আর উঠতে পারলেন না কর্নেল। বালিশের ওপরই নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে ঢলে পড়লেন।

পরে পরেই রেণরের কানে এল হঠাৎ পাশের ঘর থেকে মেয়েটার আর্ত চীৎকার। ছুটে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটি। ঘর থেকে রেণরও বেরিয়ে পড়েছেন। হাতের এক ঝাপটায় এডিথকে বারান্দায় ফেলে দিয়ে রেণর অন্ধকারের মধ্যেই দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ধরলেন নীচে নামার।

মনে হবে, তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়েই ঝাপটার সময় হাত থেকে পড়ে যাওয়া বন্দুকটা আর তার কুড়িয়ে নেওয়া হল না। আসলে

কিন্তু তা নয়। ইচ্ছে করেই ফেলে গেলেন বন্দুকটা। সিঁড়ি দিয়ে প্রায় তাঁর পিছন পিছন সেটাও এসে পড়ল নীচে।

ওপর থেকে ইতিমধ্যে এডিথ সজোরে হাঁকডাক সুরু করে দিয়েছে। জেগে উঠেছে চাকর-মহল। বাড়িময় যেন হঠাৎ একটা হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেছে।

রেণর প্রায় একদৌড়ে রান্নাঘরে। তারপর সেই জানালা, যার পর্দার নীচটুকু ফাঁক করে দেখেছিলেন। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে—অন্ধকারে।

তারপর উর্ধ্বশ্বাস দৌড় দিয়ে বাড়ির পিছন থেকে সামনে এসে ঘেসো-নুড়ি-পথ দিয়ে ছুটে চললেন গেটের কাছে, যেখানে রেখে এসেছিলেন সাইকেলটা। কারণ রেণর জানতেন, হলারটন হলে টেলিফোন আছে আর ফায়ারফিল্ড থানায় খবর যেতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। সুতরাং···।

মুখ থেকে রুমালের ঢাকাটা খুলে পকেটে পুরে সাইকেলটা বের করে সজোরে ছুটলেন ক্রম ম্যানরের দিকে।

বিনা-আলোতেই ছুটতে-ছুটতে কয়েকবারই সরু রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। চেষ্টা করেছেন সকলের চোখ এড়িয়ে, যদিও বা এই রাতে কেউ বের হয় তাকেও আড়াল করে চলে আসতে। এসেও পড়লেন। নিরাপদেই এলেন। ক্রম ম্যানরের সদর দেউড়িতে। নামলেন সাইকেল থেকে। দেখলেন একবার বাড়িটা। দুঘণ্টা আগে এই জঘন্য কাজে বের হবার সময় যেমন দেখে গিয়েছিলেন, ফিরে সেই রকমই দেখলেন। অন্ধকার, নিস্তব্ধ।

বাড়ির পিছনে ডায়না যেখানে সাইকেল রাখে, সেখানে গিয়ে সাইকেলটা রেখে রেণর রান্নাঘর দিয়ে ঢুকলেন ভিতরে। দরজায় চাবি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে এলেন দোতালায় নিজের শোবার ঘরে। আলো জ্বেলে তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে ফেললেন।

তারপর কোথাও যেন কিছুই ঘটেনি এমনি এক প্রশান্ত মানসিকতা নিয়ে রেণর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অন্ধকার ঘর। তলিয়ে গেলেন অঘোর ঘুমে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন তিনি নিজেই জানেন না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে বসলেন। কল্পনা বা স্বপ্ন নয় তো? দরজায় কল বেল বাজার শব্দ হল না?

অপরাধী বুকটা মুহূর্তের জন্যে দুরদুর করে উঠল। ঠিকই নীচে সদর দরজার পুরনো বেলটা সশব্দে বেজে চলেছে।

এত ভোরে কে আবার এল? আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন মনে মনে রেণর। কর্নেল ব্র্যাকনের খুনের ব্যাপারে নয় তো?

জানালার পর্দা দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে ভোরেব ধূসর আলো। বিছানার পাশে ঘড়িটার দিকে তাকালেন। প্রায় সাড়ে-সাতটা।

কনুই-এ ভর দিয়ে রেণর আবার কান পেতে অপেক্ষা করে রইলেন। বেল আর বাজছে না। তবে কি ডায়না শুনতে পেয়ে দেখতে গেছে? হতে পারে। কেননা ইতিমধ্যে মেয়েটা উঠে দিনের কাজ শুরু করে দেয়।

কান খাড়া রেখে রেণর শুনতে পেলেন তাঁর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল হাল্কা একটা পায়ের শব্দ। তারপরই দরজায় টোকা। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ডায়না। দেখল সে, কনুই-এ ভর দিয়ে রেণর উপভোগ করছেন জানালার পর্দা বেয়ে আসা ভোরের স্নিগ্ধ আলো।

—আপনাকে নীচে ডাকছেন।—নীচু গলায় বলল ডায়না।

—কে?—রেণরের কণ্ঠে যেন বিরক্তি।

—ফায়ারফিল্ড থেকে সুপারিনটেন্‌ডেন্ট ক্লেটন আর সার্জেন্ট অ্যানসট্রুথার।

॥ কুড়ি ॥

মুহূর্তের জন্যে একটা হিমশীতল অনুভূতি খেলে গেল রেণরের মনে। কোথাও কোন ভুল করে এসেছেন না কি? এমন কিছু ফেলে এসেছেন যাতে তিনি ধরা পড়ে গেছেন? পুলিশ অফিসার দুজন কি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন?

না। নিজের মনকেই আবার প্রবোধ দিলেন তিনি। গ্রেপ্তার করতে এলে নীচে থেকে ডেকে পাঠাবেন কেন? সরাসরি ওপরে উঠে আসতেন। এলোমেলো চিন্তার রেখাগুলো সামলে নিলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখল।

—এত সকালে ওঁদের কি দরকার?—মুখে বিরক্তি রেণরের।

—তাতো জানি না। শুধু বললেন, দেখা করতে চাই।

—কোথায়?

—ডাইনিং রুমে বসিয়ে এসেছি।

—ঠিক আছে, যাচ্ছি।—বললেন রেণর।—গিয়ে বল এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

—আচ্ছা।

দরজা খুলে রেখেই চলে গেল ডায়না। কয়েক মিনিট চুপ করে বসে নিজেকে মনে মনে ঠিক করে নিয়ে গায়ের ঢাকা খুলে বিছানায় থেকে উঠলেন রেণর।

পায়ে চটি গলিয়ে, গাউনটা গায়ে চড়াতে-চড়াতে ভাবলেন, সঙ্গে ভর্তি রিভলভারটা নেবেন নাকি। লুকিয়ে।

পুলিশকে বিশ্বাস নেই। কর্নেল ব্লাকনের খুন, পিসি বার্থা বা হান্না মোফাতের মৃত্যু—। মনে মনে খুবই অস্বস্তি, বোধ সুরু হল। কি করা উচিত এখন? ওরা ধরতে চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে দুজনকেই একেবারে উড়িয়ে দেবেন?

সার্জেণ্ট অ্যানস্ট্রুথার অত বোকা নন। হান্না মোস্কাতের মৃত্যুর দিন তাঁকে দেখে রেণরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে সার্জেণ্ট একজন ঝানু অফিসার। অ্যানস্ট্রুথারের চোখ তো চোখ নয়—যেন দূরবীন। হয়ত এসেছেন ওঁরা অন্য উদ্দেশ্যে আর অ্যানস্ট্রুথারের দূরবীন চোখ যদি গাউনের ভিতরে লুকোনো রিভলভারটা দেখে ফেলে ?

তার চেয়ে রিভলভারটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে যাই। ঠিক করে রেখে যাই, সেই ভাল। মনে মনে ভাবলেন রেণর। বরং সজাগ থাকা যাবে। গ্রেপ্তার হবার কোন সম্ভাবনা দেখা দিলেই দৌড়ে এসে হাতিয়ারটা তুলে নেবেন। সেটাই ঠিক হবে। সঙ্গে আমার হাতিয়ার আছে কি না, তা নিশ্চয় না হয়ে চট করে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাবেন না ওঁরা।

চিরুনী দিয়ে মাথাটা আঁচড়ে, পরিচ্ছন্ন হয়ে, গাম্ভীর্য নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রেণর এলেন ডাইনিং রুমে।

পুলিস অফিসার দুজন টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বেশ মজবুত গড়ন সুপারিনটেনডেণ্ট ক্লেটনের। পাকা চুল, একমুখ দাড়ি মিলিটারিদের মত ক্লিপ আঁটা।

—সুপ্রভাত।—খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়েই প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে অভিবাদন জানালেন রেণর।

—গুড্ মর্নিং স্যার।—সুপারিণটেনডেণ্ট বললেন।—এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে আসার জন্যে দুঃখিত। খবর পেলাম, গত রাতে হলারটান হলে কর্নেল ব্ল্যাকনে খুন হয়েছেন।

—কি বললেন ?—বিস্ময়ে আর আতঙ্কে যেন ভেঙ্গে পড়লেন রেণর।

—কর্নেল ব্ল্যাকনে যে বিছানায় শুয়েছিলেন, সেই বিছানায় গুলি খেয়ে মারা গেছেন।—সুপারিনটেনডেণ্ট বলে চললেন।—প্রমাণ যা আমাদের হাতে এসেছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে সক্রুস ব্যাঙ্কের

বব ফারগাসই তাঁকে খুন করেছে। তাকে আমার ফায়ারফিল্ড থানায় আটক রেখেছি।

—ফারগাস!—শুনে যেন হতচকিত হয়ে গেলেন রেণর।—আপনি কী বলছেন? হলঘরে ঢুকে কর্নেল ব্ল্যাকনেকে খুন কবে গেল?

—সে কিন্তু জোর দিয়ে অস্বীকার করছে।—বললেন ক্লেটন।—সে অবশ্য স্বীকার কবছে তাব সঙ্গে কর্নেলেব কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আর তা নাকি আপনাকে নিয়েই। এই অভিযোগ কি সত্যি?

—হ্যাঁ। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ।—শান্তভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন বেণর।

ভিতরে ভিতরে কিন্তু রেণব দারুণ একটা স্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। অফিসাব দুজন তাহলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসেন নি। ইতিমধ্যে তাঁরা ফারগাসকেই কয়েদ করেছেন। এখানে এসেছেন তাঁর অর্থাৎ রেণরের জবানবন্দী নিতে। রেণর ঠিক কবে নিলেন, যতদূর সম্ভব তিনি তাঁদের সাহায্য করবেন।

—কি ঘটেছিল, যদি জানান, বড় ভাল হয়।—বললেন ক্লেটন।

—নিশ্চয়ই বলব। যতটুকু জানি, সব বলব।

সার্জেণ্ট অ্যানসট্রুথাব নোটবই আব পেন্সিল বের কবলেন।

—গোলমালটা সুরু হয়েছিল গত পরশু থেকে।—বলতে সুরু করলেন রেণর।—আমার বাড়িব যে পরিচারিকা ছিল, তারই ভাইঝি ডায়না মোফাতের সঙ্গে ফারগাসের একটা গোপন সম্পর্ক আছে। তার থেকেই আমার অনুমান, এই বাড়ি আমার কেনার আগে থেকেই ওর এখানে যাতায়াত ছিল। শুধু তাই নয়, এ বাড়ির সবকিছু ব্যবহারও করত। দুদিন আগে দেখলাম ও আমার শৌচঘর ব্যবহার করছে। অবাক হলাম ওর ঔদ্ধত্য দেখে। নিষেধ করেছিলাম, যেন এ বাড়িতে ও আর না ঢোকে। আমাব

মুখের ওপরই বলে বসল, এ বাড়িতে না এলে ডায়নার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হওয়ার তার সুযোগ কোথায়? উত্তরে আমি বলেছিলাম, তা আমি কেমন করে জানব। আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার আগ্রহও আমার নেই। ফলে মেয়েটিকে নিয়ে আমার সম্বন্ধে খুব বাজে একটা ইঙ্গিত করল। খুব রাগ হয়েছিল আমার শুনে। বলেছিলাম, এখনি যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। সঙ্গে সঙ্গে ফারগাস রেগে আমাকে এত জোরে আঘাত করল যে আমি ছিটকে চুল্লীর পাশে গিয়ে পড়লাম। বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ধাতস্থ হয়ে উঠে দেখি ও চলে গেছে।

—মেয়েটা কি সে-সময় এখানে ছিল, দেখেছে কি স্যার।—প্রশ্ন রাখেন সুপারিটেনডেন্ট।

মুহূর্তকাল খুব দ্রুত ভেবে নিলেন রেণর। যদি বলেন 'হ্যাঁ' তাহলে নিশ্চয়ই মেয়েটির ডাক পড়বে। তাঁর এই বিবৃতির বিরুদ্ধে কিছু থাক, এটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

—হয়ত কিছুটা দেখে থাকবে।—বললেন তিনি।—ঠিক বলতে পারব না। ঘটনাটা এইখানেই ঘটেছিল, দরজা খোলাই ছিল। চেঁচামেচি, বিশেষ করে ফারগাস উত্তেজিত হয়ে যেভাবে চিৎকার করেছিল, তাতে হল ঘরের কোথাও এসে দাঁড়ান, তার পক্ষে বিচিত্র ছিল না। তবে আমার নজরে পড়েনি।

—মেয়েটির সঙ্গে পরেও এ নিয়ে কোন কথা বলেননি।—জানতে চাইলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

—না।—বেশ জোর দিয়েই বললেন রেণর।—এ নিয়ে কোন আলোচনা করার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করিনি। আমি তাকে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করার ফলে, সে আমাকে মেরেছে। এ কী বাড়ির একটা ঝির সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

—তা ঠিক। কিন্তু কেন আপনি ফারগাসকে বাড়িতে ঢুকতে

নিষেধ করলেন। মেয়েটিও তা জানতে চায়নি?

রেণর মনে মনে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই সব প্রশ্নোত্তর তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে?

রেণর বললেন—ডায়নাকে অবশ্য আমি বলেছিলাম যে ফারগাস যথেচ্ছভাবে আমার বাড়ি ব্যবহার করবে এ আমি চাই না, আমি তাকে নিষেধ করেছি। মনে হল, ডায়না আমার কথা বুঝতে পেরেছিল।

—আচ্ছা!—সুপারিনটেনডেন্ট বললেন।—আচ্ছা মিঃ বেণর তারপর আপনার আর ফারগাসের মধ্যে কি হল?

—হ্যাঁ, তাব পরের দিন মানে গতকালই ছিল।—বলে চললেন রেণর।—হান্না মোফাতের মৃত্যু তদন্তের দিন। তার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন কর্নেল ব্ল্যাকনে। তদন্তের পব আমিই ফারগাসের ব্যাপারটা কর্নেলকে জানিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কি করা যায়, উনি পরামর্শ দিলেন, আমায় জানাতে। আমি তা চাই নি। এই লজ্জাকর ব্যাপার নিয়ে কোর্টঘর হবে, কাগজে লেখালেখি হোক। আমি চাইনি। এ নিয়ে ফারগাসের ওপর কোন নিষ্ঠুর আচরণ করার বাসনাও জাগেনি আমার মনে। আমি চেয়েছিলাম, ও ক্ষমা চেয়ে নিক আমার কাছ থেকে, আর এদিকে যেন না আসে তার একটা প্রতিশ্রুতি। কর্নেল ব্ল্যাকনে বললেন, ফারগাস তো তারই ভাড়াটে। কর্নেল শুনে এত রেগে গিয়েছিলেন যে স্থিরই করে ফেললেন, যে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা না জানালে, উনি তাকে উচ্ছেদই করে দেবেন। বললেন এর মোকাবিলা এখনই করতে হবে। একটুও দেরী নয়।

—উনি ফারগাসের সঙ্গে দেখা করাব জন্যে এত তৎপর হয়ে উঠলেন কেন?—প্রশ্ন রাখেন সুপারিনটেনডেন্ট।

—কারণ তো আগেই বলেছি।—বললেন রেণর।—খুবই রেগে উঠেছিলেন তিনি। তাছাড়া।—গম্ভীর হলেন রেণর।—ওঁর সঙ্গে

ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। আমার অপমান তিনি নিজের অপমান বলেই মনে করেছিলেন।

—আচ্ছা! তাই আপনি আর কর্নেল দুজনে একই সঙ্গে তখনি গেলেন ফারগাসের কাছে?

—হ্যাঁ, আবার বলে চললেন রেণর।—মিসেস ব্ল্যাকনেই গাড়ি করে আমদের নিয়ে গেলেন।—ফারগাসেব সঙ্গে দেখা হল। ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারটা তো উড়িয়ে দিলই। তাছাড়া এ বাড়িতে সে আর ঢুকবে না, সেরকম কোন প্রতিশ্রুতিই দিল না! তার ওপর কর্নেলের কাছে আবার অভিযোগ রাখল। আমি নাকি মেয়েটিকে মেরেছি। শুনে কর্নেল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি, তখনই তাকে সক্রস ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

—এ কথা শোনার পর ফারগাসের মনে কি প্রতিক্রিয়া হল?—জানতে চাইলেন সুপারিনটেনডেণ্ট।

একটু ইতস্ততঃ করলেন রেণর। তারপর বললেন—

—আমার যা মনে হয়েছিল, শুনে ফারগাস একেবারে পাগলই হয়ে গিয়েছিল। সুরু করে দিয়েছিল দারুণ চেঁচামেচি। বলে উঠেছিল, হ্যাঁ সক্রস ব্যাঙ্ক ছেড়েই চলে যাবে, এরপর কর্নেল থাকতে বললেও আর থাকবে না। বলে উঠল কর্নেলকে এর ফল ভোগ করতে হবে। বলে উঠল সুযোগ পেলে আমাদের দুজনকেই সে এক হাত দেখে নেবে। কর্নেল ব্ল্যাকনে যখন তাকে সংযত হয়ে কথা বলতে বললেন, সেই মুহূর্তে দৌড়ে এসে কর্নেলকে আঘাত করে আর কী। মাঝখানে পড়ে বাধা দিতেই আমাকে আক্রমণ করে বসল। একেবারে তখন পাগল। এসব অনেকেই দেখেছে। সে সময় ওখানে ছিল ওর মা, ওর ছোট বোন। খামারের দুতিনজন মজুরও ছিল শুনেছেও। ঘরের দিকে তাকিয়ে ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

—তারপর কি হল?

—আর কি ? আমরা ফিরে পড়লাম। ফারগাসের মা তখন ফারগাসকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। দেখলাম ওখানে আর থাকলে খারাপ ছাড়া ভাল হবে না। গাড়ি নিয়ে বাইবে অপেক্ষা করছিলেন মিসেস ব্ল্যাকেন। ফারগাসের উদ্ধত গলা তাঁর কানেও গিয়েছিল। ফিরতেই জিজ্ঞেস করলেন, কি হল ?

—ফারগাস কেন অত চেঁচাচ্ছিল কর্নেল কী তা তাঁকে বলেছিলেন ?

—না, তখন এতই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, যে কিছুই বলতে পারেন নি। পরে সব বলেছিলেন কি না, বলতে পারব না।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন সুপারিনটেনডেণ্ট ক্লেটন, তারপর বললেন।—আর আমার একটামাত্র প্রশ্ন আছে মিঃ রেণর কিছু মনে করবেন না। এটার তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর। পুলিশের চাকরি। কর্তব্যকর্ম উপায় নেই। ডায়না মোফাতের ওপর অসদাচরণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ কি ফারগাসের আছে ?

—না।···না।···সেরকম কোন ঘটনাই ঘটেনি।—বেশ জোর দিয়েই বললেন রেণর।—আমি জানতাম ফারগাসের মুখ চেয়ে আপনারা এরকম একটা প্রশ্ন আমায় করতে পারেন। তাই আমি, মনে কিছু করছি না।

—ধন্যবাদ।—জানালেন সুপারিনটেনডেণ্ট।

তারপর সার্জেণ্টকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেন করলেন—মিঃ রেণরের কাছ থেকে জানার জন্যে আপনার কি আর কোন প্রশ্ন আছে ?

—হ্যাঁ স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে।—নোটবই থেকে চোখ তুলে বললেন সার্জেণ্ট।—মি. রেণর যা বললেন, তাতে কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে দুদিন আগে রাতে মিঃ রেণর আর ফারগাসের মধ্যে যে বাদ প্রতিবাদ হয়েছিল, কর্নেল ব্ল্যাকনে আর ফারগাসের মধ্যে বিবাদ তারই প্রত্যক্ষ ফল।

—না। আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি।—নিজেকে বেশ সংযমের মধ্যে রেখে বললেন মিঃ রেণর।—খামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পথে কর্নেলের বিরুদ্ধে ফারগাসের দু-একটা অভিযোগ আমার কানে এসেছিল। মালিক হিসেবে খামার বাড়িতে আরো টাকা দেওয়া উচিত, ঘর-দোর মেরামত করা উচিত। চেঁচিয়ে কর্নেলের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য কয়েকটা মন্তব্যও করেছিল। যদি বলেন, আমি সেগুলো আপনাদের শুনিয়েও দিতে পারি।

—বলুন। আমরা শুনতে চাই।—বললেন সুপারিনটেনডেন্ট।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রেণর অশ্রাব্য কয়েকটি বিশেষণ শুনিয়ে দিলেন নিছক বানিয়ে। মনে মনে এরই মধ্যে স্থির করে নিয়েছিলেন মিঃ রেণর, ফাঁদে যখন পড়েছে বব ফারগাস, যাতে কোনরকমেই ওর রেহাই না মেলে, তার বন্দোবস্ত তাঁকে করতেই হবে।

—ঠিক কি প্রশ্ন আপনি মিঃ রেণরকে করতে চাইছেন, সার্জেন্ট! —জিজ্ঞেস করেন সুপারিনটেনডেন্ট।

—আমি মিঃ রেণরের কাছ থেকে যা জানতে চেয়েছিলাম, তাতে অন্য প্রসঙ্গ এসে গেল স্যার।—বললেন সার্জেন্ট—আমার প্রশ্ন ছিল, —মিঃ রেণরের দিকে তাকিয়ে এবার জিজ্ঞেস করেন সার্জেন্ট,—ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে কর্নেল আর ফারগাসের মধ্যে যে বিরোধ তা আপনার ঘটনাকে মূলত কেন্দ্র করে, যদিও এটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। ফারগাস কর্নেলের ওপর যে পরিমাণে উত্তেজিত হয়েছিল, আপনার ওপরও তার কিছু কম ছিল না। তাছাড়া আপনি নিজেই বললেন, আপনাদের দুজনকেই সে শাসিয়েছিল। যদি তাই হয়। তাহলে গত রাতে আপনাদের দুজনকেই ওর আক্রমণ করা স্বাভাবিক। সেই দিক থেকেই আমার প্রশ্ন, গতরাতে আপনি কি বাইরে কোন সন্দেহজনক শব্দ শুনেছিলেন স্যার?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন।—বললেন রেণর।—গতকাল প্রায় মাঝরাতে আমার জানালার বাইরে থেকে একটা শব্দ যেন আমার

কানে এসেছিল। পায়ে চলার শব্দ। তখন আমি এখানে বসে লিখছিলাম। কানে আসতেই একটু সজাগ হয়েছিলাম। আর কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পাইনি। তখন মনে হল হয়ত শুনেছি।

—বাড়িতে কি তখন ভেতর থেকে তালাচাবি ছিল?—জিজ্ঞাসা করেন সার্জেণ্ট।

—হ্যাঁ···হ্যাঁ···। মেয়েটি শুতে যাবার আগে তালাচাবি দিয়েই যায়।

সার্জেণ্ট তার ওপরওলার দিকে একটা কটাক্ষ হানলেন।

—ফারগাস যদি সে-সময় এসে থাকে স্যার, তাহলে জানালার আলো দেখে বুঝতে পেরেছিল মিঃ রেণর জেগে আছেন। তাই তখন চলে গিয়েছিল। বোধ হয় সেই অপেক্ষাতেই ছিল, মিঃ রেণর যখন শুয়ে পড়বেন তখন কাজ হাসিল করবে।

—এসব তোমার অনুমান অ্যানসট্রুথার।—বললেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।—তবে তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাইছ, ফারগাস যদি অপরাধীই হয়ে থাকে, তাহলে, যাঁর ওপর তার সবচেয়ে বেশী রাগ, সেই মি- রেণরই তার প্রথম শিকার হওয়া উচিত ছিল। তা না হয়ে হলেন মি ব্ল্যাকনে। সেদিক থেকে মি. রেণর বলতে পারেন, খুব জোর বেঁচে গেছেন।

—তা যা বলেছেন। খুব খাঁটি কথা।—বললেন মি. রেণর।—এরকম কোন সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

মি. রেণরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন সুপারিনটেনডেণ্ট। তারপর বললেন—আপনার সময় আর নষ্ট করতে চাই না। এবার আমরা একটু ডায়না মোফাতের সঙ্গে কথা বলতে চাই।—যদি একটু ডেকে দেন।

॥ একুশ ॥

মি রেণর পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারলেন, বেল বাজিয়ে রেণরকে ডাকতে বলার উদ্দেশ্য পাছে এখানে আসার আগে তার সঙ্গে নিভৃতে তাঁর কোন বাক্যালাপ হয়, তার সুযোগ না দেওয়া। পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশে মনে মনে দুটো কটু-মন্তব্য করলেন তিনি।

তিনি জানতেন সব জেনেশুনেই তিনি তাঁদের প্রতারণা করেছেন, বিপথে চালিত করেছেন, তবুও নির্ভীক হয়েই এগিয়ে গেলেন চুল্লীর কাছে। বাজালেন বেলটা। মিনিটকয় পর ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দিকে ঘরে ঢুকল ডায়না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—সুপারিনটেনডেণ্ট ক্লেটন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।—ছোট্ট কথায় তাকে বললেন রেণর।

সুপারিনটেনডেণ্টের দিকে তাকাল ডায়না। মুহূর্তের জন্যে একটা আতঙ্কের অনুভূতি জাগল রেণরের মনে। সেই সঙ্গে একটু উদ্বেগ। জিজ্ঞাসাবাদের সময়টা এখানে থাকতে পারলে ভাল হত। পরমুহূর্তেই সজাগ হলেন। না, সেটা ঠিক হবে না। অযাচিত এই উদ্বেগ প্রকাশ ঠিক হবে না। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে দরজা বন্ধ করে।

তবুও, সেই মুহূর্তে আবার দুর্বলতা পেয়ে বসল তাঁকে। ভাবলেন, এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন হয়? কিন্তু, এখান থেকে তো কিছুই শুনতে পাবেন না। তার ওপর সার্জেণ্ট যদি হঠাৎ দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে যায়? যদি দেখেন তিনি এখানে পায়চারি করছেন, তাঁদের মনে দারুণ সন্দেহ জেগে উঠবে। না। এতল্লাটে থাকা আদৌ ঠিক হবে না।

মুখ ফিরিয়ে সোজা চলে গেলেন ওপরে নিজের শোবার ঘরে। ঘরে ঢুকেই দেখলেন, জানালার পর্দাগুলো সব খোলা। ডায়না, তার অবর্তমানে নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল।

জানালার কাছে দাঁড়ালেন রেণর। ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। কিন্তু মাথার ভিতরে বলতে শুরু করল চিন্তার আনাগোনা।

আচ্ছা, মেয়েটা যদি সব সত্যি কথাই পুলিশ অফিসারকে বলে তাহলে কি পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে? তার এবং ফারগাসের মধ্যে যা ঘটেছিল, ডায়না যদি কোন কিছু গোপন না রেখে সবই বলে, তাহলে কর্নেল ব্ল্যাকনের এই খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর ওপর কোন সন্দেহ জাগতে পারে?

অনেকক্ষণ ভাবলেন রেণর। তারপর স্থির করলেন, না।— তাঁর ওপর কোন অভিযোগ আসতে পারে না। শুধু একটা অভিযোগ ছাড়া তা হল, তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আর তার ওপর তাঁর বাকি কথাগুলো নস্যাৎ করে দিতে পারেন। আচ্ছা, তাতে ফারগাস আর কর্নেল ব্ল্যাকনের মধ্যে যে বিবাদ হয়েছিল তা কি উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে? না। পারবেন না কারণ খুনের স্থলে পাওয়া গেছে ফারগাসেরই বন্দুক।

তাছাড়া, তিনি নিজে লেখক, সকলের পরিচিত, সকলের সম্মানিত একজন মানুষ। তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়ে ডায়না আর ফারগাসের মত দুজন নগণ্য মানুষের কথাই শুনবেন, এটা কোন যুক্তি সম্মত কথা হবে না।

দূর, এসব বাজে চিন্তায় নিজেকে তিনি কেন বিব্রত করেছেন? কোনদিক থেকেই তাঁর আশঙ্কার কোন কারণই নেই। এটা অবশ্য ঠিক ফারগাসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্যে কাঠগড়ায় তাঁকে একবার দাঁড়াতে হবেই। কী হবে? বাইরের আশপাশের কিছু মানুষজন তাঁর সম্বন্ধে গুণগুণ করবে। এ ছাড়া?

আচ্ছা, ফারগাসকে যে খুনের দায়ে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। এতে ডায়নার মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে! নিশ্চয়ই খবরটা শোনার পর মনে মনে খুবই আঘাত পাবে। বড় চতুর মেয়ে। এবার যে তার ওপর একহাত নিতে পেরেছেন রেণর। ভেবে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করলেন নিজে নিজেই।

নীচে গাড়ির শব্দ উঠতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন রেণর—পুলিশেরই গাড়ি। গাড়িতে উঠে বসলেন সুপারিনটেনডেন্ট ক্লেটন আর সার্জেন্ট। বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলেন। তারপর খুব তাড়াতাড়ি নেমে এলেন নীচে ডায়নার সন্ধানে।

দেখলেন ডায়না রান্নাঘরে প্রাতরাশ তৈরী করতে ব্যস্ত। দূর থেকে একটু'খন ডায়নাকে নিরীক্ষণ করলেন রেণর। খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ফারগাস—শুনে, ডায়না নিশ্চয়ই মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু, তার কোন লক্ষণই তিনি দেখলেন না তার মধ্যে। দেখলেন যেন কোন রেখাপাতই করে নি।

—কি ডায়না! খবরটা শুনলে।—বললেন রেণর।—এখন তোমার ফারগাস সম্বন্ধে কি ভাবছ?

—আমি বিশ্বাস করি, তার যথেষ্ট মনের জোর আছে।—জবাব দিল ডায়না।

রেণর চমকে উঠে তাকাল তার দিকে। ধীর, স্থির। অকম্পিত কণ্ঠ। আর যে জবাবটা দিল, এর পর আর কোন কথাই চলে না। মনে-মনে রেগে উঠলেন রেণর।

—তাহলে তুমি কি মনে করছ ফারগাস অপরাধী?—তবুও কথা চালালেন রেণর।

—জানি না।—জবাব দিল মেয়েটি।—সব ঘটনা জানি না। পুলিশও বলে নি।

—তোমাকে তাঁরা কি জিজ্ঞেস করলেন।—জানতে চাইলেন রেণর।

—ওঁরা শুধু জানতে চাইলেন। বব কর্নেল ব্ল্যাকনেকে ভয় দেখিয়ে কোন কথা বলে থাকলে আমি তা শুনেছিলাম কিনা! আর আমাকে কেন্দ্র করে বব আর আপনার মধ্যে কোন বাদ-বিসংবাদ হয়েছিল কিনা?

—আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে এসবের মধ্যে কেন ওঁরা জড়াতে চাইছেন।—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ওঠেন রেণর।—তা তুমি সুপারিনটেনডেটকে কি বললে?

ঠিক এই প্রশ্নটা যেন শুনতে পেল না সে।

—কেন আপনাকে জড়াবে না, সেটাই তো ভেবে পাই না।—বলল ডায়না।—আপনার সঙ্গে ববের যদি বিরোধ না বাধত, তাহলে কর্নেলকে আপনি এসব বলতেন না। কর্নেলও তাকে সক্রস ব্যাঙ্ক থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতেন না। আর ঐ দুজনের মধ্যে কোন মনো-মালিন্যই ঘটত না।

—ওকথা থাক। তুমি পুলিশকে কি বললে?

—আমি বলেছি, কর্নেলের বিরুদ্ধে ববের সেরকম কোন মন্তব্য আমি শুনিনি। আমাকে কেন্দ্র করে আপনার ওপর ববের কোন ঈর্ষা পোষণ বা বিবাদ হবার কোন কারণই নেই। তার সঙ্গে একথাও বলেছি।—এবার একটু পরিহাস ছলে বলল ডায়না।—আমার সঙ্গে আপনি এযাবৎ ভদ্র আচরণই করে এসেছেন।

শুনে দারুণ যেন এক স্বস্তি বোধ করলেন রেণর। স্পষ্ট শোনা গেল সেই স্বস্তির নিঃশ্বাস। মৃদু হাসিও হাসলেন।

—তুমি কী সত্যিই একথা তাঁদের বলেছ! আমি ভদ্র আচরণই করেছি?

—হ্যাঁ। সত্যিই বলেছি।—বলে মুখ তুলে এবার সরাসরি ডায়না তাকাল রেণরের দিকে।—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি। কোন কিছুতেই আমার ভয় পাবার কিছু নেই। এখন যান, স্নান-টান সেরে নিন। ডাইনিং রুমের চুল্লী জ্বালিয়ে দিয়েছি।

তৈরী হয়ে আসতে-আসতে আপনার প্রাতরাশও হয়ে যাবে।

—যাচ্ছি ডায়না। একটা কথা। ফারগাস যে অভিযুক্ত হল এর জন্যে কোন কষ্টবোধ করছ না?

—এখনও তো তার ফাঁসি হয়নি।

—না। তা হয়নি। কিন্তু হতে পারে।—রেণর একটু গলা চড়িয়েই বললেন।

—আমার কষ্টবোধ কি তাকে বাঁচাতে পারবে?—জবাব দিল ডায়না।

শুনে আর একবার চমকে উঠলেন রেণর।

—সে কথা নয় ডায়না। আমার সঙ্গে ফারগাসের বিরোধের সত্য ঘটনা তুমি পুলিশকে বললে পারতে। পুলিশের সন্দেহ জাগাতে পারতে আমার ওপর। অপরপক্ষের উকিল চেষ্টা করতেন, করত কেন, আমি জানি বলে বলছি করবে, যে প্রচণ্ড রাগে ফারগাসের মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল। তারই ফলে সে খুন করেছে।

—কর্নেল ব্ল্যাকনের সঙ্গে ববের কথা কাটাকাটি হয়েছে গতকাল দুপুরে।—বলল মেয়েটি। আর খুনের ঘটনা ঘটেছে, দেখা যাচ্ছে, আজই ভোর রাতের কোন সময়। আমার তো মনে হয় না, এর সঙ্গে রাগ বা ক্ষোভের কোন সম্পর্ক আছে। যদি কোন জাঁদরেল উকিল তা প্রতিপন্ন করতে পারেন তাহলে বব সম্বন্ধে অনেকখানি নিরাশই হতে হবে।

—হায় ভগবান।—বলে উঠলেন রেণর। এত সহজভাবে তুমি এসব কথা কিভাবে বলতে পারছ! তোমাকে সে ভালবাসে। আজ নয়, অনেকদিন থেকেই। তার ওপর কী তোমার কোন মায়া-দয়াই জাগছে না?

আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি, আমার মন-মুখ দুটো নয়।—জবাব দিল মেয়েটি।—বোধ হয় ববের দিক থেকেই স্নেহটা

বেশী ছিল।—তারপর একেবারে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—আপনি অন্ত্যেষ্টি কাজে যাবেন তো?

—যাব। নিশ্চয়ই যাব।—সঙ্গে সঙ্গে বলেন রেণর।

এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, মেয়েটিকে যতটা সম্ভব খুশী রাখার চেষ্টা এখন তাঁকে করতেই হবে।

—তাহলে আর সময় নষ্ট না করে, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফেলুন। তা নইলে এগারোটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নেওয়া যাবে না।

ঠিক বেলা এগারোটা। ফায়ারফিল্ড থেকে গাড়ি-এল। ডায়নাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন রেণর। পিছনে হান্না মোফাতের শাবাধার। এগিয়ে চলল গাড়ি রাস্তা ধরে কবরখানার দিকে। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেশ বড় একটা কালো গাড়ি এত জোরে তাদের পাশ দিল যে ডায়নার গাড়ির ড্রাইভারকে কোন রকমে সামলে নিতে হল গাড়ি। ভিতরে ওঁবা দুজনেই ফলে জোরে দুলে উঠলেন।

—ধরে চাবকাতে হয়।—গর্জন করে উঠলেন রেণর।

—ওটা পুলিশের গাড়ি।—ধীরভাবে বলল ডায়না।

কপাল কোঁচকালেন রেণর। এমন কি ঘটল যে এত জোরে শহরের দিকে পুলিশের গাড়ি ছুটল।

মাত্র দুজন শোকযাত্রী। মনে মনে বিদ্রূপ করলেন রেণর। অবশ্য ঠিক ঠিক শোকযাত্রী যদি বলা যায় তাহলে সত্যিই কি তাঁরা তাই? শয়তানীটা মরেছে, তিনি নিজে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। তা নইলে পাওনাদারের কাগজের টুকরোটা নিয়ে সারা জীবন তাঁকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত। আর ডায়না! না, ডায়নাকেও ঠিক দুঃখিত বলা যায় না। কেননা, তারই মুখ থেকে তিনি শুনেছেন যে, হান্নাকে সে মোটেই ভালবাসত না।

পাশাপাশি গাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে রেণর কালো দস্তানা ঢাকা ডায়নার মসৃন হাতে ঈষৎ একটু চাপ দিলেন। মুখ

ফিরিয়ে মৃদু একটু হেসে আঙুলের ডগেই প্রত্যুত্তর জানাল ডায়না।

এই মৃদু হাসি আর নীরব প্রত্যুত্তর, রেণরের কাছে মনে হল একটা বোঝাপড়া। তাঁর সম্বন্ধে ডায়না যা-ই জেনে থাকুক, বিশ্বাস-ঘাতকতা সে করবে না, এমন একটা ধারণা যেন হঠাৎ বদ্ধমূল হয়ে গেল রেণরের মনে।

একই মহল, একই বাড়িব তাঁরা মাত্র দুজন বাসিন্দা। মোহাবিষ্ট করা বাড়ি। এ-বাড়িতে ছেড়ে যেতে মন চায় না। বড় ব্যথা বাজবে তাঁর বুকে এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে। যেমন রেণরের, তেমনি ডায়নারও। প্রাণ দিয়ে সে-ও যেন ভালবেসে ফেলেছে এই বাড়িকে। এ বাড়ির তাঁরা যেন মোহাবিষ্ট দুটি কণ্ঠ, দুটি সুব।

—আমি বলেছিলাম, দেখবার জন্যে অনেকেই জুটবে।—বলল ডায়না।

কবরখানার দিকে বাঁক নিতেই দেখা গেল গ্রামেব বেশীর ভাগ মহিলারই ভীড়।

—শকুনের দল!—খিঁচিয়ে উঠলেন বেণর।

হাসল মেয়েটি' মনে মনে যেন বেশ খানিকটা মজা অনুভব করল। ছোট্ট একটা গির্জার সামনে এসে দাঁড়াল শবাধার।

অনাড়ম্বরেই মিটে গেল গির্জাব কাজ। কবরের ধারে ডায়নার পাশে দাঁড়িয়ে রেণর। হান্নার শাবাধাব আস্তে আস্তে নেমে গেল মাটির নীচে। চাপা পড়ে গেল মাটি।

॥ বাইশ ॥

রাস্তায় পুলিশের যে গাড়িটা বেপরোয়াভাবে ডায়নাদের গাড়িটা পাশ দিয়ে এসেছিল, থামল এসে ফায়ার ফিল্ড থানার সামনে। গায়ে একটা আধ-ময়লা ম্যাকিনটশ, মাথায় ফেল্টের টুপি, মোটা-সোটা একটি মানুষ নেমে এলেন গাড়ি থেকে। থানা ঘরের সামনেই

একজন অফিসার বসে কি যেন লিখছিলেন। আগন্তুক আসতেই মুখ তুললেন নীরব প্রশ্ন নিয়ে।

—আমি অফিসার-ইন-চার্জ, সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক্লেটন না কী যেন নাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন? কি নাম আপনার?

—আমি ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর বুলক। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসছি।—বললেন সেই মোটা মানুষটি।—আর চাই এক কাপ বেশ গরম ভাল চা মিষ্টি দিয়ে। মিষ্টিটা একটু বেশীই খাই।

অফিসার আর প্রত্যুত্তর না করে চলে গেল।

সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক্লেটনের অফিস ঘরে আগুনের দিকে পা টান-টান করে চেয়ারে দেহটা এলিয়ে বসলেন বুলক। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন খালি কাপটা।

—আসুন। বলুন তো ব্যাপারটা কি?

সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক্লেটনও সময় নষ্ট না করে কর্নেলের খুন এবং সন্দেহে ফারগাসকে গ্রেপ্তারের সমস্ত ঘটনাই শোনালেন তাঁকে সংক্ষেপে।

—এ তো পরিষ্কার ব্যাপার।—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন বুলক।—উদ্দেশ্য পেয়েছেন, বন্দুক পেয়েছেন, কর্নেলের মেয়ে খুনীকে সনাক্ত করে দিয়েছেন,...তাহলে আর কি চাই? আমাকে ডাকলেন কেন?

—কারণ আমাদের সার্জেন্ট অ্যানসট্রুথার ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ওঁর ধারণা ঠিক খুনীকে ধরা হয়নি।—বললেন ক্লেটন।—প্রধান কনস্টেবল আমাদের ক্যাপ্টেন নরম্যান। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরই ওঁর সন্দেহ আরো দানা বেঁধেছে। তাই ক্যাপ্টেনকে পাঠানো হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।

—ও:।—বুলক পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে মুখে ফেলে দৃঢ় চোখ যদিও তাকালেন সার্জেন্টের দিকে তবুও

ক্লেটনকে উদ্দেশ করে বললেন—তাহলে সার্জেন্ট অ্যানসট্রুথারই কি আপনার মনে এই কেস সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়েছেন ?

—না। চেষ্টা তিনি যথেষ্টই করেছিলেন।—বললেন ক্লেটন—সম্ভাব্য সব জায়গাতেই ঘা দেওয়া হয়েছে। আমার মতে আমরা ঠিক খুনী ফারগাসকেই ধরেছি। সার্জেন্ট অবশ্য একটা গুরুত্ব-পূর্ণ দিক আমার নজরে এনেছিল।

—কী সেটা?—জানতে চাইলেন বুলক।—অ্যানস্ট্রুথার, আপনি বরং নিজেই বলুন।

—ব্যাপারটা হল স্যার।—খুব দ্রুত বলে গেলেন সার্জেন্ট।—ফারগাসকে যখন খামার বাড়িতে ধরতে গেলাম, সে হলফ করে বললে রাত দশটার পর সে রাতে সে শুতে গেছে নিজের ঘরে আর ঘুম ভাঙ্গছে আমাদের ডাকাডাকিতে। আমরা যখন বন্দুকটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম, এটা তার কিনা, সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল তার। আবার হলফ করে বলল, সে রাতে আর সে হল ঘরে নামেই নি। শুতে যাবার আগেও দেখে গিয়েছিল নীচে বসার ঘরের যে কোণে তার ছিপ, একজোড়া সারস আর বন্দুক থাকে, সেখানেই বন্দুকটা ছিল। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে সে রাতে নিশ্চয়ই অন্য কেউ খামার বাড়িতে ঢুকে থাকবে এবং বন্দুকটা চুরি করে থাকবে। ভাবলাম, এটা একটু খতিয়ে দেখি। বসবার ঘরের জানালাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একটা জানালার ছিটকানিতে সামান্য একটা সদ্য আঁচড়ের দাগ চোখে পড়ল। হলঘরে ঢোকার জানালার ছিটকানিতেও দেখলাম সেই রকমই; অস্পষ্ট আঁচড়।

—অ…অ…।—বললেন বুলক।—দেখে আপনার মনে হল না কেন যে এটা তদন্তকে ভুল পথে চালাবার জন্যে ফারগাসেরই একটা চালাকি ?

—অস্বীকার করি না। তা হতে পারত।—বললেন সার্জেন্ট।

—কিন্তু আমি নিশ্চিত ফারগাসের মাথায় সে মগজ নেই। ও ছেলেটা একেবারে নীরেট বোকা। আবার দেখুন, যে খুন করল, মিসেস ব্ল্যাকনে তাকে দেখলেন। সে আবার তার বন্দুকটাও ফেলে গেল। যদিও সে সময় রুমাল দিয়ে তার মুখ চাপা ছিল। তবুও সে মিসেস ব্ল্যাকনের মুখোমুখি না হয়ে সরে পড়তে পারত।

—না। এ দিয়ে তার বন্দুক চুরি যাওয়ার গল্প ঠিক বিশ্বাস-যোগ্য নয়।—জবাব দিলেন বুলক।—ছাড়ুন ওসব কথা। এটা একটা চাতুরী। ছাড়ুন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু পায়চারি করে নিয়ে আবার বললেন ক্লেটনকে—তাকে একবার দেখতে চাই। এখানে আনান।

কয়েদ ঘর থেকে ফারগাসকে আনতে যাওয়া হল। বুলক সার্জেন্টকে বললেন,—হ্যাঁ, আপনি দেখছি ভালই মাথা ঘামিয়েছেন। যুক্তিগুলো যেভাবে তুলে ধরলেন, ভালই।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝানু গোয়েন্দার এই সপ্রশংস উক্তিতে সার্জেন্ট মনে মনে একটু উল্লসিত হয়ে উঠতেই বুলক আবার বললেন —তার মানে এই নয়, বা আশা করি না, এ দিয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পেঁাছতে পারব।

মুখের চকোলেটটা সশব্দে একবার শুষে নিয়ে আবার বলে চললেন—

—একই ব্যাপার। ফারগাসের ওপর এই খুনের দায় যদি চাপানোই হয়ে থাকে, তাহলেও এটা তো ঠিক, কারো কারো কর্নেলের ওপর রাগ ছিল। এমনও হতে পারে ওদের দুজনের ওপরেই রাগ ছিল। এ ব্যাপারে কাউকে আপনার কি সন্দেহ হয়?

—না স্যার।—অসহায়ভাবে জানালেন সার্জেন্ট।—এইখানেই আমি হেরে যাচ্ছি। কর্নেল ব্ল্যাকনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অমন ঠাণ্ডা মাথায় কে খুন করতে পারে। বুঝতে পারছি না। জেলার সর্বজন-পরিচিত, সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। কারোর কোন ক্ষোভ

তাঁর ওপর ছিল বলে মনেই করতে পারছি না।

—ফারগাস সম্বন্ধে আপনার কি ধারনা?—জানতে চাইলেন বুলক—তাকেও কি সকলে ভালবাসে?

—না, কয়েকজন আছে, যারা যাকে পছন্দ করেন না।—বললেন সার্জেণ্ট।—তবে এভাবে ওকে ফাঁদে বা বিপদে ফেলার মত মানসিক জোর তাদের নেই।

—ওটা স্ব-ন্ত্র কথা। বিচার সাপেক্ষ।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জেলার-সহ ফারগাসকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই চুপ করে গেলেন বুলক। ফারগাসের হাতে হাতকড়া। চোখ দুটো যেন লাল গোলাপ। বুঝতে পারা যায় অবিরত কেঁদেছে আর চোখ মুচেছে। ফ্যাকাসে মুখ, দুর্বল শরীর।

—ফারগাস, ইনি হলেন ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর বুলক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এসেছেন।—শান্তভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্লেটন। —উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

বুলক যেন কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ফারগাসের দিকে। তাঁর ছোট্ট কুতকুতে চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে ভুরুর চুলগুলো। তারপর বেশ নরম সুরেই বললেন।

—তুমি তাহলে কর্নেল ব্ল্যাকনেকে খুন করনি?—বললেন তিনি।

একটা আশার আলো যেন ঝকমক করে উঠল তার চোখে। উত্তেজনায় বুলকের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বাধা দিল জেলর।

—না।—বেশ জোর দিয়েই বলল ফারগাস।—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, না।

—কে করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

—বলতে পারব না।—ফারগাস বলল।—আমি কিছুই বলতে পারব না। আমি সারারাত ঘুমিয়েছি। স্যার আমায় বিশ্বাস

করুন, বিশ্বাস করুন। একাজ আমি করতে পারি না। আমার অতি বড় শত্রু হলেও না।

ফুঁপিয়ে উঠল বব।

—থাম।—প্রায় ধমক দিলেন বুলক।—কেঁদে কোন লাভ হবে না। তোমার কথা অনুযায়ী তোমার বসার ঘর থেকে বন্দুকটা চুরি গেছে। তুমি যে বন্দুকটা ঘরে রেখেছিলে, কেউ দেখেছিল?

—হ্যাঁ, অনেক-অনেকেই দেখেছিল।

—বেশ।

আবার একটু পায়চারি করে নিলেন বুলক। তারপর ফারগাসের দিকে তকিয়ে বললেন:

—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কর্নেলের কি নিয়ে বিবাদ হয়েছিল? সত্যি কথা বলবে।

—আমি সত্যি কথাই বলেছি।—কাঁদতে কাঁদতে বলল ফারগাস।—সুপারিনটেডন্ট ক্লেটনকে আমি সব সত্যি কথা বলেছি। শপথ করে বলছি, কিচ্ছু গোপন করিনি।

—ঠিক আছে। যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিক ঠিক জবাব দাও তো?

—সব কিছুর মুলে ক্রম ম্যানরের মি. রেণর।—আবেগের সঙ্গে বলে উঠল ফারগাস।—সেই লোকটাই সব কিছুর মূলে। তার নোংরামি আর চালাকির ফাঁদে যদি কর্নেল না পড়তেন তাহলে তিনিও আমাকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতেন না, আর কোন ঝামেলাই হত না। যা তা মিথ্যা লাগিয়েছে আমার নামে। আমি নাকি তার বাড়ি যথেচ্ছ ব্যবহার করি…

—আর আমি যাকে ভালবাসি; সেই মেয়েটা।—এবার যেন একটু রাগে ফুঁসে উঠল ফারগাস।—ওর বাড়ি কাজ করে। বাড়িতে থাকে একমাত্র রেণর আর সে। একদিন তাকে যখন দেখলাম, মেয়েটাকে সে মারতে উদ্যত হয়েছে। আমি থাকতে না

পেরে, এক ঘুসিতে তাকে ফেলে দিয়েছিলাম। পরদিনই কর্নেল ব্ল্যাকনেকে নিয়ে খামার বাড়িতে এসে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে গেল। সে মেয়েটার গায়ে হাত তোলেনি। মিথ্যুক! আমার কাছ থেকে সে লিখিত ক্ষমা চাইলে আমি তা দিলাম না। তার ওপর লোকটার ঐ নোংরামি আমাব মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, আবার আমি তাকে মারতে উদ্যত হতেই কর্নেল আমাকে থামিয়ে উচ্ছেদের নোটিশ দিলেন।

এক ভুরু চুল কুতকুতে চোখ নিয়ে বুলক একবার তাকালেন ক্লেটনের দিকে।

—মেয়েটার জবানবন্দী নিয়েছেন?—জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। সে কিন্তু ফাবগাসের এই অভিযোগ জোর দিয়ে অস্বীকার করেছে।—বললেন সুপারিনটেনডেন্ট।—সে বলেছে, ওর কথাব মধ্যে একটুও সত্যি নেই। তার বক্তব্য; মি. রেণর তার সঙ্গে কোনদিনই দুর্ব্যবহার করেন নি। ভদ্র ব্যবহারই করে আসছেন।

—সে অস্বীকার করেছে?—প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠল ফারগাস।—আপনি সত্যি বলছেন, সে অস্বীকার করেছে।

হাঁটু দুমড়ে সেই মুহূর্তে হয়ত ফারগাস পড়ে যেত মেঝেয়, যদি না ঠিক সেই সময় সার্জেন্ট আনস্ট্রুথার আর জেলর তাকে ধরে না ফেলতেন।

—ওকে একটু জল দিন। বুলক বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস জল এনে ধরা হল ফারগাসের ঠোঁটে।

—তুমি যাকে ভালবাসো, সেই মেয়ে অস্বীকার করায় মনে হচ্ছে তুমি খুব ধাক্কা খেয়েছ?—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুলক তাকালেন ফারগাসের দিকে।

—না, সে অস্বীকার করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করিনা, যে সত্যকে সে অস্বীকার করবে।- বলল ফারগাস।

—সে অস্বীকারই করেছে।—বেশ জোর দিয়েই বললেন ক্লেটন।

কেঁদে উঠল ফারগাস। বুক কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মাথা ঝুঁকে পড়ল তার বুকের ওপর।

—তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল ফারগাস।—সে যখন এতবড় সত্যকেও অস্বীকার করেছে, তাহলে তারা দুজনেই এর মধ্যে আছে।

কিসের মধ্যে?—তীক্ষ্ণ প্রশ্ন বুলকের।

অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়েছে ফারগাস, উত্তর দেবার সামর্থ নেই। বুলক দুহাতে তার কাঁধটা ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—থাম, তুমি বললে মি. রেণর আর মেয়েটা দুজনেই এর মধ্যে আছে। কিসের মধ্যে?

—আমাকে মিথ্যাবাদী সাজানোর মধ্যে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল ফারগাস।—তার সঙ্গে রেণরের কোন ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়নি, যখন রেণর…।

কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে বুলক কয়েক পা পিছিয়ে এলেন। বললেন—একে নিয়ে যাও।

॥ তেইশ ॥

কয়েদখানায় ফারগাসকে আবার ঢুকিয়ে রাখার কাজ শেষ হলে বুলক খানিকটা আগুন পুইয়ে নিলেন। ক্লেটন আর সার্জেণ্ট যাতে দেখতে পান, সেইভাবেই আগুনের পাশে চেয়ারে বসে পা-দুটো ছড়িয়ে দিলেন।

—এখানে কোথাও মাছ আর আলুভাজা পাওয়া যাবে।—জানতে চাইলেন বুলক।

—হ্যাঁ।—শুনে একটু আবাক বুলেন ক্লেটন।— কেন?

—কারণ, আমার খিদে পেয়েছে, খেতে হবে।—বুলক বললেন। —ওয়েদারবি দিয়ে আসার পথে কিছু খাওয়া হয়নি। কাউকে পাঠিয়ে দোকান থেকে আনান। ঐ প্লেট-ফ্লেটের ঝামেলা করতে হবে না। কাগজে মুড়ে আনলেই হবে।

—এখানে তো ওর চেয়ে ভাল খাবার আপনার জন্যে করা আছে।—সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রতিবাদ জানালেন।

—কে বলেছে আমার জন্যে খাবার করতে?—চোখ বুজে বলে ফেললেন—আমি যেটা বললাম, ওটাই আমার খেতে ভাল লাগে।

মনে-মনে একটু অসন্তুষ্টই হলেন সার্জেণ্ট। এর আগে বুলকের সুনাম খোলাখুলি আচরণ সম্বন্ধে অনেক কথায় শুনেছেন তিনি। তবে এই প্রথম মুখোমুখি হচ্ছেন।

খবরের কাগজে মুড়ে বুলকের নির্দেশমতই দোকান থেকে মাছ আর আলুভাজা এল।

—সত্যিই আপনার প্লেটের দরকার নেই।

—না। কোন প্রয়োজন নেই।—আঙ্গুলটাকেই কাঁটার মত করে সুরু করে দিলেন আহার।—এখন যে কথায় আসছি, মিসেস ব্ল্যাকনেই ফারগাসকে সনাক্ত করেছেন। তার বাবার শোবার ঘর থেকে সে ফারগাসকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছেন, তাই না। হলফ করে বলতে পারবে তো?

—হ্যাঁ তা পারবে।—বললেন ক্রেটন।

—মেয়েটা কি রকম! খুব ভীরু?

—না। তা বলব না। বেশ সুস্থ, সবল আর বুদ্ধিমতী।

—আততায়ীর মুখ যখন রুমাল দিয়ে ঢাকা, তখন ফারগাসকে তিনি চিনলেন কিভাবে?

—তার পোশাক দেখে। মাথার টুপি, ম্যাকিনটশ, গারটার দেখে। ঐ পোশাকই ফারগাস সব সময়ই পরে থাকে।

—সব সময়?

—দশ দিনের মধ্যে ন'দিন তো বটেই।—বললেন সুপারিনটেণ্ডেন্ট।

বেশ বড় একটা মাছের কাঁটা মুখ থেকে বের করে চুষে-চুষে পিছনের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বুলক।

—ছেলেটার দেখছি মাথায় ছিট আছে।—মন্তব্য করলেন বুলক।—সে দরজা খুলে হলে ঢুকল, ম্যাকিনটশ, গারটার পরে। যা সকলের কাছে তার মুখের মতই পরিচিত। আবার মুখটা ঢাকল রুমাল দিয়ে। নরকের পাপ! তা পোশাকগুলো কোন কিছু চাদর টাদর দিয়ে ঢাকতে পারল না?

সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক্লেটন চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কিন্তু সার্জেন্টের চোখে-মুখে কেমন একটা আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। তাজা মুচমুচে একটা ভাজা আলু বুলক খবরের কাগজ থেকে তুলে ধরলেন সার্জেন্টের দিকে।

—সার্জেন্ট আপনার কথা এখন আমার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।—বললেন,—হলঘরের জানালার ছিটকানি খুলতে গিয়ে তাতে যে সূক্ষ্ম আঁচড়ের দাগের কথা আপনি বললেন অত নিখুঁত সাবধানী কাজ করার মত বুদ্ধি ফারগাসের মত ছোকরার যে নেই এটা বুঝতে পারছি।

বুলক আর একবার তাকালেন সুপারিনটেণ্ডেন্টের দিকে।

—যদি অমন সূক্ষ্ম আঁচড়ের কাজ যা সার্জেন্ট বলছেন, তা জাল করার বুদ্ধি ও ছোকরার থাকত।—বলে চললেন বুলক,—তাহলে এই বুদ্ধি ওর মাথায় এল না কেন, যে পোশাক রোজই সে ব্যবহার করে সেই পোশাক পরেই এই অপকর্ম করতে যাবে? দুটোকে কি ঠিক মেলানো যায়?

বাকি আলুভাজাগুলো মুখে ফেলে দিয়ে কাগজেই হাত মুছে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে আগুনে ফেলে দিয়ে এবার জিজ্ঞেস করলেন বুলক—

—আচ্ছা রেণর লোকটি কেমন ?

—যথেষ্ট ভদ্রলোক।—জোর গলায় বললেন সুপারিনটেডেন্ট। —বিশ্বাসযোগ্য।

—আমার মনে হয়, আপনাদের ঐ রেণর না হয় ফারগাস, দুজনের মধ্যে যে কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছে। আপনাদের কাকে মনে হয় ?

—ফারগাস...ফারগাস।—কোনরকম দ্বিরুক্তি না কার বললেন ক্লেটন।

বুলক কুতকুতে চোখ নিয়ে একবার তাকালেন সার্জেন্টের দিকে।

—আমার তো স্যার, মনে হয় না, রেণর মিথ্যা বলছেন।—সম্মতি জানালেন সার্জেন্ট।—সে ধরনের মানুষ তিনি নন বলেই আমার ধারণা।

আচ্ছা মেয়েটি কি রকম ?—সুপারিনটেডেন্টের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন বুলক।—তাকে কি রকম মনে হল।

একটু ইতস্তত করলেন ক্লেটন।

—আমি ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।—ধীরে ধীরে বললেন ক্লেটন।—মেয়েটা যেন একটা রহস্য। ঐ মহলে জীবনভোর আছে ওর পিসির সঙ্গে। পিসিই ঐ মহল দেখাশোনা করত। গ্রামের কারো সঙ্গেই মেশে না। একা-একাই থাকে।

—আপনার কি ধারণা অ্যানসুথার ?

—ঠিক ঠিক বলা খুব কঠিন স্যার।—বললেন সার্জেন্ট।—বেশ গভীর। তল পাওয়া শক্ত। আমি কি বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার মনে হল, ও যখন বলল মিঃ রেণর ওর সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেননি, যেন সত্যি কথাই বলল।

বুলক ফিরে তাকালেন সুপারিনটেন্টের দিকে।

—আপনি বললেন মেয়েটার পিসি মহল দেখাশোনা করত। এখনও তাই করে নাকি ?

—না।। গত বেস্পতিবার জানালা থেকে পড়ে মারা গেছে। আজ সকালে সৎকার হল।

—কিভাবে পড়ল।

—তদন্তে জানা গিয়েছিল,—বললেন ক্লেটন,—তেতলার জানালা সাফ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল। ওর নাকি মাঝে-মাঝে মূর্চ্ছা হত। এমনি দুর্ভাগ্য ; গত ববিবার রাতে ঐ মহলেই মিঃ রেণরের পিসি নিজের শোবার ঘরে আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

বুলক কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ক্লেটনের দিকে।

—হায় ভগবান! ভদ্রলোক তাহলে সত্যিই দুর্ভাগা?' ঐ ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল ?

—তদন্তের সাক্ষী অনুযায়ী, শোবার ঘবে চুল্লীর পাশে বৃদ্ধা রাতের পোশাক পরে বসে থাকতে-থাকতে নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় চুল্লার কয়লার আগুন ধরে গিয়েছিল পোশাকে। তাতেই মারা যান। করোনার রায় দিয়েছিলেন—দুর্ঘটনা।

বুলক একমিনিট চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলেন—ভদ্রমহিলা কি কোন টাকা-কড়ি রেখে গেছেন ?

—আমাব বিশ্বাস, বেশ মোটা টাকাই, রেখে গেছেন।—বললেন ক্লেটন।

—কার কাছে ?—জানতে চাইলেন বুলক !

—ঠিক বলতে পারব না, শোনা কথা, মিঃ রেণরই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকার।—জবাব দিতেই বুলকের চোখ আরো কুঁচকে উঠল। তাই দেখে ক্লেটন বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—এখানে সন্দেহের কিছু নেই। জলের মত পরিষ্কার—দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

—ওটা আপনার ব্যাপার। ওখানে আমার কিছু বলার নেই। —গম্ভীরকণ্ঠে বললেন বুলক।—দুর্ঘটনাটা কখন ঘটেছিল ? সাড়ে দশটায় ?

এগিয়ে গেলেন বুলক টেবিলের দিকে। তুলে নিলেন নিজের পুরনো ফেল্ট টুপিটা। বললেন—দেখুন তো বাইরে আমার গাড়িটা আছে কিনা? মিস্ ব্ল্যাকনের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।

॥ চব্বিশ ॥

রাত হয়েছে। ড্রেসিং গাউনটা চাড়িয়ে সবে মাত্র শুতে যাবেন মিসেস ব্ল্যাকনে, ঝি এসে খবর দিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ডিটেকটিভ-ইন্স্পেক্টর বুলক এসেছেন তাঁব সঙ্গে দেখা করতে।

—বললেন. মিস এডিথের সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আমি তাঁকে ড্রয়িংরুমে রেখে এসেছি।

—ভালই করেছ, এলেন। –বললেন এডিথ।—আমি এক্ষনি যাচ্ছি।

গাউনের ওপর ক্লোক চড়িয়ে নিয়ে এডিথ তক্ষনি বৈঠকখানায় এসে দেখেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আগত মানুষটি চুল্লীতে পিঠ সেঁকছেন।

—আপনিই মিস্ ব্ল্যাকনে?—এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বললেন—আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসছি; ডিটেকটিভ ইন্স্পেক্টর বুলক। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। একটু বলবেন? রাত হয়ে গেল বলে দুঃখিত।

বাধ্য-মেয়েটির মত চেয়ারে বসলেন এডিথ।

কোন ভূমিকা না করে বুলক সরাসরি প্রশ্ন রাখেন—আপনার বাবার শোবার ঘর থেকে গত রাতে আপনি রবার্ট ফারগাসকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—আপনি তো তার মুখটা দেখতে পাননি। সেটা তো রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল ?

—না। মুখ দেখতে পাই নি।

—তাহলে চিনলেন কিভাবে ?

—ওর টুপি, ম্যাকিনটশ, গারটার। যেখানে যেভাবেই থাকুক চিনতে কোন অসুবিধে হবে না।

একটু চুপ থেকে বুলক হুম করে জিজ্ঞেস কবে বসলেন—আচ্ছা, ফাবগাসের চোখের রঙ কেমন ?

হঠাৎ এমন একটা প্রশ্নে বেশ হকচকিয়ে গেলেন এডিথ।

—ঠিক···মানে···আমতা আমতা করে বললেন এডিথ।—ঠিক বলতে পারব না। নীল···নীল রঙ্। হ্যাঁ ফারগাস সুপুরুষ। চোখের রঙ তার নীল।

—আপনি একেবারে নিশ্চিত নন, তাই না ?

—না। আমি নিশ্চিত।—বললেন এডিথ।—প্রথমটায় ঠিক স্মরণে আসে নি। ফারগাসের চোখ নীল।

—গত রাতে যখন তার মুখোমুখি হয়েছিলেন, আপনি কি তার নীল চোখ দেখেছিলেন। শুনেছি, সে চোখ ঢাকা দেয় নি। নিশ্চয়ই তার চোখে আপনার চোখ পড়েছিল।

—আমি···আমি দেখিনি। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গিয়েছিল যে তার চোখ দেখার সময় আমি পাইনি।

কিন্তু আপনি যে তার মুখটা দেখেছিলেন, তা তো অস্বীকার করতে পারেন না।

—হ্যাঁ। কিন্তু চোখের দিকে তাকাই নি।—আমতা-আমতা করে সম্মতি জানাল এডিথ।—তাকে দেখে আমি....আমি এমনই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম ?

—মিস্ ব্ল্যাকনে।—সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বললেন বুলক।—আপনার একটা কথার ওপর নির্ভর করছে একটা মানুষের জীবন।

সেই দিকটা মনে রেখেও কি আপনি হলফ করে বলবেন? আপনি যাকে দেখেছেন, সে ঐ রবার্ট ফারগাস?

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে খুব নীচু গলাতেই বললেন এডিথ—হ্যাঁ···হ্যাঁ। গতরাতে আমি যাকে দেখেছি সে ফারগাস। আমি হলফ করেই বলতে পারি।

—শুধু পরনে ম্যাকিনটশ, টুপি আর গারটারের ওপর নির্ভর করে তাই না?

চুপ করে থাকলেন এডিথ। বুলক আবার রাখলেন একই প্রশ্ন।

—আপনি হলফ করতে পারেন এই দেখে, তাই তো? আর কিছু দেখে নয়। তাই না?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।—সেই নীচু গলাতেই সম্মতি জানালেন এডিথ।

চুপ করে বসে এডিথকে একটু ধাতস্থ হবার সময় দিয়ে বললেন বুলক—আমি যা বলছি, এবার তা মন দিয়ে শুনুন। আমি যদি বলি গত রাতে আপনি যাকে দেখেছেন সে রবার্ট ফারগাস নয়! যদি বলি, ওর টুপি থেকে গারটার পর্যন্ত হুবহু পোশাক পরে অন্য কেউ ফারগাস সেজে এসেছিল! আপনি কি হলফ করে বলতে পারেন, এ সম্ভাবনা মিথ্যে?

একটু থতমত খেয়ে জবাব দিল এডিথ—না, সেখানে আমি হলফ করতে পারব না।

তাহলে যদি বলি, গত রাতে আপনি যাকে দেখেছেন সে ফারগাসের পোশাক-পরা অন্য কেউ?

—তা···তা··হতে পারে।—একমত হয়েও এডিথ বলল—তবুও আমি ঠিক। আমি যে ফারগাসকেই দেখেছি, তার মধ্যে কোন ভুল নেই।

—ঠিক আছে... ঠিক আছে....ও প্রসঙ্গ এখন থাক। এখন

আর একটা কথা বলুন তো? আপনার বাবা আর ফাবগসের মধ্যে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল? ফারগাস কি আপনার বাবাকে শাসিয়েছিল? আপানার বাবা কি তা শুনে বেশ বিচলিত হয়েছিলেন?

—বলতে পারব না। বাবা ওসব নিয়ে কোন আলোচনাই করেন নি।

—ঝগড়া-ঝাঁটি যে হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই জানতেন?

—হ্যাঁ, তা জানতাম।

—আপনার বাবা যখন এনিয়ে কোন আলোচনাই আপনার সঙ্গে করেন নি, কিভাবে জানলেন?

—আমাকে মিঃ রেণরই বলেছেন।

—কখন?

—গতকাল সন্ধ্যেয়। নিউ ক্যাসেল থেকে আমাদের ফেরার পথে।

—যখন কারা···কারা···নিউ ক্যাসেল থেকে ফিরছিলেন? আপনি আর মিঃ রেণর?

—হ্যাঁ আমরা কিছু কেনা-কাটা করার জন্যে নিউ ক্যাসেল গিয়েছিলাম।

বুলকেব কুতকুতে চোখ যেন মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—নিউ ক্যাসেলে কেনা-কাটা করতে গেলেন কখন? ফারগাস, আপনাব বাবা আর মিঃ রেণরের ঝগড়া-ঝাঁটির পর। তাই তো?

—হ্যাঁ—গতকাল বিকেলে। বাবা গতকাল দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাবার জন্যে মিঃ রেণরকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। মিঃ রেণর বলেছিলেন, কিছু কেনা-কাটা আছে। এখনই বাস ধরে নিউ ক্যাসেল যেতে হবে। বাবা বলেছিলেন এখনই বাসে যাবেন কেন, খাওয়া-দাওয়ার পর আমার মেয়েই না হয় গাড়ি নিয়ে যাবে।

আমি রাজী হয়েছিলাম, কারণ আমারও কিছু কেনা-কাটা ছিল।

—ওঃ। এইভাবে আপনারা দুজনে নিউ ক্যাসেলে গিয়েছিলেন? সব সময় একই সঙ্গে ছিলেন নিশ্চয়ই।

মেয়েটি চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—মিঃ বুলক, আপনার এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য?

—উত্তেজিত হবেন না।—গম্ভীর কণ্ঠে বলেন বুলক।—যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দিন। আপনারা কি সব সময় একই সঙ্গে ছিলেন?

সাদা হয়ে গেল এডিথের মুখ।

—না। আমরা প্রায় এক ঘণ্টার জন্যে একসঙ্গে ছিলাম না। মিঃ রেণর তাঁর উকিলের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনে চলে গিয়েছিলেন।

—আপনি? আপনি আপনার দোকান-পাতি করলেন?

—হ্যাঁ।

—মিঃ রেণর তাঁর কেনা-কাটা কখন করলেন?

—উকিলের সঙ্গে দেখা করতে যাবার ফাঁকে।

—তিনি যখন দোকান-পাতি করলেন আপনি কি সঙ্গে ছিলেন?

—না। উনি পৌঁছেই আগে চলে গিয়েছিলেন উকিলের কাছে। আবার একসঙ্গে হয়েছিলাম চা খাবার সময়।

—তা ঠিক আছে। তবে তিনি কী কেনা-কাটা করলেন, তা নিশ্চয়ই দেখেছিলেন? অবশ্য এটা আমার ধারণা।

—আমি শুধু একটা পার্শেল প্যাকেট দেখেছিলাম। গাড়ির পিছনে এনে রেখেছিলেন।

—কি রকম পার্শেল?—জানতে চাইলেন বুলক।

চুপ থেকে গেলেন মেয়েটি। মুখ ফ্যাকাসে।

—চুপ করে গেলেন কেন? বলুন কি রকম পার্শেল?

—একটা ছিল বেশ বড়।—তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন এডিথ—আর একটা ছোট গোল।

—গোলটা কতখানি গোল? এই রকম?—এই বলে বুলক তাঁর রোমশ হাতের আঙুলগুলো প্রায় এক ফুট গোল করে দেখালেন।

—হ্যাঁ ঐ রকম হবে।

—আর এদিকটা।—বলে নীচে-ওপরে আঙুল রেখে বললেন—ওর অর্ধেক। তাই তো।

চুপ করে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন এডিথ।

—আচ্ছা! ঠিক আছে মিস ব্ল্যাকনে। এবার আপনি শুতে যান—।বললেন বুলক।—কিছু মনে করবেন না, অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে।

বাইরে বেরিয়ে মুহূর্তকাল গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করে নিলেন। তারপর গাড়িতে উঠে হুকুম করলেন—ক্রম ম্যানর। তবে বাড়ির একেবারে সামনে নয়। দূরে থামবে।

॥ পঁচিশ ॥

প্রায় মাঝরাত। যেখানে এসে থেমেছিল তাঁর উপন্যাস, তার পর থেকে দ্রুত লিখে চলেছেন ডাইনিং রুমে বসে। চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। একমনে লিখে চলেছেন সেই রোমাঞ্চকর উপন্যাস অতি দ্রুত।

হঠাৎ চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে নির্জন সেই বাড়ির বাইরের দরজার বেলটা ঝন্ ঝন্ করে উঠতেই এমন চমকে উঠলেন, যে কাগজ ফুটো করে কলম গেল আটকে।

কান খাড়া করে শুনতে শুনতে অপরাধী মন তাঁর দুলে উঠল,

কেঁপে উঠল বুক। টান-টান হয়ে চেয়ারে বসলেন, নিশ্চল। এত রাতে কে এল?

সাড়া না পাওয়ার একটু পরেই আবার বেজে উঠল বেল। এবার একটু বেশীক্ষণ ধরে।

ডায়না এখন ঘুমোচ্ছে। রেণর জানেন, সাড়া দিতে গেলে তাঁকেই দিতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উদ্বেগ। ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বারন্দা দিয়ে এলেন সদর দরজায়। চাবি খুললেন। সামনেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মোটা-সোটা একটি মানুষ—মাথায় পুরনো একটা ফেল্টের টুপি—তোবড়ানো, পরনে পুরনো ম্যাকিনটশ।

—কে? কি চাই এখন?—ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন রেণর।

বুলক তাঁর টুপির কোনাটা একটু ছুঁয়ে বললেন—অসময়ে বিরক্ত করলাম, দুঃখিত!—যেন যথেষ্ট পরিমাণে মদ গিলেছেন।—আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

—কে হে তুমি? কী দরকার এত রাতে?

—হুজুর আমার নাম সিম্পসন।—বলে আগন্তুক একবার চারিদিকে সেই অন্ধকারের মধ্যেও যেন সজাগ দৃষ্টি বুলিয়ে আবার তাকালেন রেণরের দিকে একদৃষ্টে। বললেন—হুজুর, খুব একটা গোপন কথা ছিল।

—ত্যাখ ভ্যানভ্যান্ কোরো না।—বিরক্তির সুরে বললেন রেণর।—যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে বিদেয় হও।

—গতকাল বিকেলে নিউ ক্যাসেলের যে দোকানে আপনি কেনা-কাটা করেছিলেন হুজুর, সেই ব্যাপার নিয়েই।—ফিসফিস করে বললেন আগন্তুক।—সেই দোকানের ম্যানেজারই আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

মুহূর্তে রেণরের মুখে রক্ত প্রবাহ খেলে গেল। আতঙ্কিত

হয়ে উঠলেন তিনি। কী হল আবার?

—ভিতরে এস।—ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন রেণর।

বুলক ঢুকলেন দরজা পেরিয়ে বাড়ির ভিতর। বেণর আবার দরজা বন্ধ করে ফিরে এলেন ডাইনিং রুমে। বুলকও এলেন পিছু পিছু।

—বল, কি ঝামেলা বাধল?—জানতে চাইলেন রেণর মুখোমুখি বসে।

—হুজুর, দোকানে পুলিশের হামলা হয়েছে।—মাথার টুপিটা নাড়তে-নাড়তে বললেন আগন্তুক।—জানতে চাইছিল, ক্রুম ম্যানরের ক্লাইভ রেণরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা?

শুনে ভয়ে এমনি ঘাবড়ে গেলেন রেণর যে কিছুক্ষণ গলা দিয়ে কোন কথা বের হল না।

—তারা আপনার কথাই বলছিল, হুজুর। তাই জানতে পারলাম। জিজ্ঞেস করছিল। লম্বা, দেখতে সুন্দর সেই ভদ্রলোক আমাদের দোকান থেকে কোন ম্যাকিনটশ, টুপি আর গারটার গতকাল বিকেলে কিনেছিলেন কিনা? সেলস্ম্যানের আপনার নাম মনে পড়েছিল হুজুর। কারণ ম্যাকিনটশ বাছতে আপনি অনেকখানি সময় নিয়েছিলেন।

—পুলিশকে সেকথা সে বলেছে নাকি?—হঠাৎ প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসতেই মনে-মনে নিজেকে গালি দিলেন রেণর। কিন্তু এযে বড় সাঙ্ঘাতিক! তাঁকে যে জানতেই হবে।

—ঠিক যে বলেছে, তা বলব না। আবার একেবারে যে বলেনি, তাও বলা যাবে না, হুজুর।—বললেন আগন্তুক। সে বলেছে তার মনে পড়ছে আপনার মতো এক ভদ্দরলোক এসব কিনতে এসেছিলেন। কিন্তু কে তিনি, তা সে বলতে পার না। আর, আবার দেখলেও যে চিনতে পারবে, তাতেও সন্দেহ আছে। বুঝতে পারলেন হুজুর।

শুনলেন বটে রেণর। কিন্তু অর্থ কি দাঁড়ালো তা বোঝার মত

ক্ষমতা ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর ছিল না। শুধু মাথার ভিতর একটা চিন্তাই বাররার পাক খেতে সুরু করল যে গতকাল বিকেলে তিনি যা কেনা-কাটা করেছেন পুলিশ তার সন্ধানে ফিরছে। ভিতরটা রেণরের যেন হিম হয়ে যেতে লাগল।

একথা বলার জন্যে এত রাতে তোমার এখানে আসার কি প্রয়োজন পড়ল ?—ওরই মধ্যে নিজেকে সামলে রাখাব জন্যে গলায় স্বর চড়ালেন রেণর।

—হুজুর, আমি বুঝতে পারছি আমার আসতে দেরি হয়েছে।—যেন অপরাধ স্বীকার করছেন আগন্তুক।—আরো আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কি করব? দোকান বন্ধ হল রাত আটটায়। তারপর কোনরকমে একমুঠো খেয়েই ফায়ারফিল্ডের বাস ধরেছি। তারপর এতটা হেঁটে। ম্যানেজারই পাঠালেন।

—কেন? ম্যানেজার পাঠাল কেন?

—হুজুব, আমি ঐ দেকানের সর্দার খবরদার। খুব ছোটবেলা থেকেই ওখানে কাজ করছি। সকলে আমাকে বিশ্বাসও করে। আজই সন্ধ্যেবেলা ম্যানেজার আমাকে ডেকে আপনার বর্ণনা দিয়ে বলল—'জো! গতকাল সন্ধ্যেয় মিঃ রেণর দোকান থেকে এই এই জিনিস কিনে নিয়ে গেছেন। আর এক ভদ্দরলোকও কিনেছেন। আমাদের কোন খরিদ্দারকে আমরা অসন্তুষ্ট করতে চাই না। পুলিশের ঝামেলায় পড়ুক, তা-ও চাই না। তুমি বরং ব্রুম ম্যানরে মিঃ রেণরের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বোলো। আমাদের দোকানের তো একটা সুনাম আছে। তাই হুজুর আমি এখানে এলাম। বুঝতে পারলেন।

ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিয়ে একদৃষ্টে আগন্তুক তাকিয়ে থাকলেন রেণরের দিকে।

—যত সব ঝামেলা! দারুণ একটা বিরক্তি প্রকাশ করলেন রেণর।—তোমার ম্যানেজার যেমন বোকা, তোমাকেও তেমনি

বোকা বানিয়েছে ; আর এত রাতে কষ্ট দিয়েছে। জিনিষ পত্রগুলো কিনে গাড়িতে রেখেছিলাম। সেখান থেকেই ওটা চুরি যায়। পুলিশকে জিনিষের বিবরণ দিয়ে ডাইরি করেছিলাম। বোধ হয় পুলিশ তা যাচাই করার জন্যেই তোমাদেব দোকানে গিয়ে থাকবে। তা এটা তো সরাসবি আমাকে জিজ্ঞেস কবলেই পারত। এত রাতে তোমাকে কষ্ট দেওয়াব কি অর্থ, তা তো বুঝি না।

—পুলিশ তো, আমি জানি হুজুব ওদেব। বড় ছ্যাচড়া, বড় সন্দেহবাতিক। যাকগে হুঁজুব। এখন বুঝতে পারলাম। যে পোশাক-আশাকগুলো আপনি কিনেছিলেন সেগুলো আপনার গাড়ি থেকে খোয়া গিয়েছিল আর আপনি তা পুলিশকে জানিয়েছিলেন। তাই দোকানে পুলিশ গিয়েছিল। যাক্ ব্যাপারটা পবিষ্কার হয়ে গেল। আমি এখন নিশ্চিন্তে যেতে পারি।

উঠে দরজার দিকে মুখ ফেরাতে গিয়েই আগন্তুকের নজরে পড়ল তাকে মদের পাত্রের দিকে।

—হুজুব!—বিনয়েব সঙ্গে বলল আগন্তুক।—ফায়ারফিল্ড পর্যন্ত এবার হেঁটে ফিরতে হবে। বড্ড ঠাণ্ডা। দয়া করে যদি একপাত্র ছান্…!

—অবশ্যই।

একটা গ্লাসে পাত্র থেকে ঢেলে দিলেন মদ রেণর। আঙ্গুলগুলো তখন তাঁর কাঁপছিল।

—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।—বলে গ্লাসটা একবার ওপর দিকে তুলে গলায় ঢেলে দিলেন আগন্তুক।—আঃ! এবাব তাহলে চলি। গুড্ নাইট।

আগন্তুক চলে গেলে দরজায় আবার আগের মত চাবি লাগিয়ে ডাইনিং রুমে ফিরে আবার পথেই থমকে একবার দাঁড়ালেন। দেখলেন, হাতে বাতি নিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে আসছে ডায়না। আলোর হলুদ আভায় মুখ তার বিবর্ণ।

॥ ছাব্বিশ ॥

কোন কথা না বলেই রেণর ঢুকে গেলেন ডাইনিং রুমে। ডায়নাও অনুসরণ করল তাঁকে। পায়ে টকটকে লাল একটা চটি, পরনে সিল্কের কালো পায়জামার ওপর টকটকে লাল রঙের চাদর।

বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে টেবিলে রেখে উৎসুক দৃষ্টি মিলে ধরল সে রেণরের দিকে।

—কে এসেছিল ?

—কোন কথা বলতে পারলেন না রেণর। উত্তর যোগাল না মুখে। পুলিশ তাঁর সন্ধানে ফিরছে, শুধু এটাই তখন তাঁর মাথায় পাক খাচ্ছে। পুলিশ পিছু নিয়েছে। যেখান দিয়েই হ'ক আর যেভাবেই হ'ক, তাঁর শয়তানী চাতুরী ফাঁস হয়ে গেছে। এটা ভাবতে গিয়েই ভয়ে অবশ হয়ে গেছেন তিনি। চুল্লীর আগুনের পাশে দাঁড়িয়েও রেণর যেন কাঁপছেন।

আস্তে আস্তে ডায়না এগিয়ে গেল তাঁর আরো কাছে। তাকালো তাঁর বিবর্ণ মুখের দিকে।

—কে এসেছিল ?—শান্তভাবে রাখল সেই একই প্রশ্ন।

—জানি না।—ফেটে পড়লেন যেন রেণর।—বলতে পারব না।

কিভাবে বলবেন ? বলতে গেলে তো সবকিছুই বলতে হবে।

আগুনের পাশে চেয়ারে ধপ করে বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। পিছু নিয়েছে পুলিশ। গুটিয়ে আনছে জাল। এখন। এখন কী করবেন তিনি। সুযোগ থাকতে থাকতে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তাই করবেন। কিন্তু কতখানি যেতে পারবেন ? ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই পুলিশ নজর রাখতে শুরু করেছে।

মেয়েটা—হাঁটু দুমড়ে পাশে বসে। সজাগ হয়ে উঠলেন তিনি।

—কি হয়েছে আপনার। কি হল।—তেমনি মৃদু স্বর ডায়নার।—আপনি তো জানেন, আমাকে বিশ্বাস করা যায়। কখনো বিশ্বাস-ঘাতকতা করিনি।

না। তা ঠিক। ভাবলেন রেণর। এইভাবে ভেসে যাওয়ার মুহূর্তে একটা অবলম্বন…হ্যাঁ একটা অবলম্বন চাই। কারো ওপর আস্থা রেখে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

কিন্তু কিভাবে এখন ডায়নাকে বলবেন যে কর্নেল ব্ল্যাকনেকে তিনিই খুন করেছেন আর পুলিশ তাঁর পিছু নিয়েছে।

—কে এসেছিল যদি বলেন,—মেয়েটি বলল,—হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

সাহায্য আমাকে…সাহায্য আমাকে! চিন্তায় যেন উন্মাদ হয়ে উঠলেন রেণর। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তাঁর সাহায্যেরই বড় দরকার।

রেণর তাকালেন তার চোখের দিকে। সহানুভূতি যেন ঝরে পড়ছে সেই চোখ থেকে। ভাল লাগছে তার সান্নিধ্য। হ্যাঁ, এখন সে-ই তাঁর বন্ধু…একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু।

আর থাকতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে হাতে মুখ ঢাকলেন তারপর যেন কেমন করে বলে গেলেন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা।

—একাজ আমি করেছি, ফারগাসকে ঘৃণা করি বলে।—বেপরোয়াভাবে বললেন রেণর।—এ কাজ আমি করেছি কারণ সে আমার গায়ে হাত তুলেছিল, তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বলে। এখন!…এখন ওরা আমার পিছু নিয়েছে—ওরা…পুলিশ।

কাতরতায় ভেঙ্গে পড়লেন রেণর। নিস্তব্ধ কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। তারপর ঝুলে পড়া, বিবর্ণ মুখ তুলে তাকাল মেয়েটির দিকে। হাঁটুতে ভর দিয়ে তখনো সে তেমনিভাবেই বসে তার পাশে। মুখে মৃদু হাসি।

—আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।—বলল মেয়েটি।

—ভয় খাবার কিছু নেই।—বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়লেন রেণর।

—কী-বলছ তুমি! ভয় খাবার কিছু নেই?

—আপনি যা বললেন, আমি তা সব জানতাম।—ফিসফিস করে বলল ডায়না।—আপনি যা যা করেছেন আমি সব জানি।

—জান?—আঁৎকে উঠলেন রেণর।—কেমন করে জানলে!

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রেণর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মেয়েটিও।

—শুনুন।—খনখন করে উঠল ডায়নার কণ্ঠস্বর। রেণরের মর্ম ভেদ করে সে যেন তাকাল তার দিকে।—আজই হ'ক আর কালই হ'ক, এরকম একটা পরিণতিতে আসতেই হত। এই মহলে আপনি আছেন, আমি আছি। আমরা নির্ভর করে আছি পরস্পরের ওপর। আবার আমরা দুজনেই নির্ভর করে আছি এই মহলের ওপর। আমরা তিনে মিলে এক। শয়তানের ত্রিমূর্তী। যে জগতকে আপনি জানতেন, চিনতেন, এখন সেখানে আর আপনি ফিরে যেতে পারবেন না। তবে এখানে আপনি নিরাপদ। আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

—কী বলছ তুমি? এর পরেও আমার ভয়ের কিছু নেই?

কমনীয় মুখ মেয়েটির আরও কমনীয় হয়ে উঠল। আবার হাসল সে—সেই মৃদু হাসি। তারপর নীচুগলায় বলল যেন ফিসফিস করে:

—আমি আপনাকে বাঁচাতে পারি। কর্নেল ব্ল্যাকনে যে রাতে খুন হয়েছেন, সে রাতে আপনি যে বাড়ি-ছাড়া হন নি, বরং সব-সময়ই এই বাড়িতে ছিলেন, হলফ করে তা প্রমাণ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার।

নিদারুণ হতাশার মাঝে এইভাব যে একটা আশার আলো দেখা যেতে পারে, তা ছিল রেণরের কল্পনারও অতীত। আকুল দৃষ্টি মেলে তিনি তাকালেন তার দিকে।

—ডায়না! ডায়না, তুমি হলফ করে প্রমাণ করে দেবে যে সে রাতে আমি বাড়িতেই ছিলাম, বাড়ির বাইরে যাই নি।

—হ্যাঁ দেব।—তেমনি ফিসফিস করে বলল ডায়না।

নিঃসঙ্কোচে এরপর ডায়না যে চেয়ারে রেণর বসেছিল সেখান থেকে ধরে তুলে এনে বসালো টেবিলের সামনের চেয়ারে। আচ্ছন্নের মত তিনিও উঠে এলেন। আতঙ্কে হারিয়ে গেছে তাঁর নিজের সব অস্তিত্ব। মেয়েটিই যেন এখন তাঁর একমাত্র ভরসা।

একটা কাগজ এগিয়ে ধরল ডায়না তার দিকে। হাতে তুলে দিল কলম। মৃদুস্বরে বলল—যা বলি, লিখুন।

ধীরে ধীরে যেন গুণগুণ করে মেয়েটি যা বলে গেল, সুবোধ বালকের মত রেণর তাই লিখে গেলেন। না, এই মুহূর্তে, কোন কিছু ভাববার, ক্ষমতা তাঁর আর একটুও নেউ। নতুন করে আর ভাবতেও চান না। মেয়েটি যে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, তা একবার নয়, অনেকবারই প্রমাণ হয়ে গেছে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও অবিশ্বাসের কোন কারণই নেই।

লেখা শেষ করে নীচে সই করলেন। তারপর কিছু একটা মনে আসতেই, কুলকুল করে হেসে পুনশ্চ দিয়ে তার নীচে আরও একটু লিখলেন।

কাঁধের ওপর ঝুঁকে মেয়েটি।

রেণর লেখার পর মুখ তুলে তাকাতেই চোখ দুটো তাঁর বিস্ফারিত হয়ে গেল। এ-কী! ডায়নার হাতে মিশমিশে কালো···! চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ আর এক ঝলক ধোঁয়ার মাঝে বিলীন হয়ে গেল রেণরের জগৎ।

আর্তনাদের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যেতে না যেতেই সশব্দে ঘরের দরজা যেন ভেঙ্গে পড়ল। খুলে গেল বন্ধ ঘর। হাতে ধূমায়িত রিভলভার, চকিতে ঘুরে দাঁড়াল ডায়না। দেখতে পেল মাথায় একটা নোংরা পুরোনো টুপি, গায়ে ম্যাকিনটশ, মোটা একটি-মানুষ

এগিয়ে আসছে তার দিকে। হুঁশিয়ারী দিয়ে আবার তখনি তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল সে। কিন্তু তার আগেই যেন চোখের পলকে মানুষটি এসে গেছে টেবিল ডিঙ্গিয়ে তার কাছে।

সশব্দে আলোর কুপীটা পড়ে গেল মেঝেয়। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়ল তার গরম তেল। ইতিমধ্যে একলাফে সেই মোটা মানুষটি এসে তাকে ধরে ফেলতেই শুরু হয়ে গেল ধ্বস্তাধ্বস্তি। বুনো বেড়াল যেন তখন ডায়না। টুকটুকে লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আশ্রাব্য কথা আর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে মুক্ত হবার—যেন এক অশরীরী-ক্ষমতায় তখন সে উন্মত্তা। কিন্তু মুহূর্ত পরেই লোহার শক্ত হাত-কড়ার বাঁধনে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল তার সব হাত ছোঁড়াছুঁড়ি।

॥ সাতাশ ॥

সকাল।

ফায়ারফিল্ড থানায় সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে চেয়ারে বসে ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর বুলক। ঘরে সুপারিনটেনডেন্ট ক্রেটন আর সার্জেন্ট অ্যানসট্রুথার।

—রেণরের ওপর আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল, এই মাত্র।—বললেন বুলক—ফারগাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল, যে ফারগাস মিথ্যা কথা বলছে না। তাহলে, রেণর কোন কিছু গোপন করে যেতে পারে। এডিথ ব্ল্যাকনের সঙ্গে দেখা করে তাই গিয়েছিলাম রেণরের সঙ্গে দেখা করতে। বলতে পারেন, একটা সুযোগ নিয়েছিলাম। ওর মনে মরার ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেও, ঘুরে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আবার ঢুকেছিলাম বাড়ির ভেতর, শুধু লক্ষ্য রাখার জন্যে। ওর মনে যে ভয় আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তার প্রতিক্রিয়া কী হয়, নিছক

তা দেখার জন্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে আসিনি। ওরা কেউ টেরও পায়নি, বা, ভাবতেও পারেনি যে আমি আবার বাড়ির ভেতর থাকতে পারি। শুনতে পেলাম, ডাইনিং রুমে রেণর আর মেয়েটা কথা বলছে, দরজা বন্ধ। আমি পা-পা করে এসে দরজায় কান পেতে সব শুনলাম বটে, তবে ফিসফিস করে যে কথাগুলো হল, সেগুলো শুনতে পেলাম না। তারপরই শুনতে পেলাম গুলির আওয়াজ। মেয়েটা রেণরের একেবারে মুখের ভিতর গুলি চালিয়েছে !

—ওঁকে গুলি করতে গেল কেন মেয়েটা ?—বিস্মিত সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট প্রশ্ন করেন।—ওঁকে মেরে ফেলে মেয়েটার কি লাভ হল ?

—মেয়েটার নামে উইল লেখাটা শেষ হবার পরই মেরেছে।—বললেন বুলক।—এটা ওর টেবিলেই পড়েছিল, যে উপন্যাসটা লিখছিল তারই সঙ্গে। নিজের জন্যে আধ-পয়সাও রাখেনি। মেয়েটা মহল মেরামতে, রক্ষণা-বেক্ষণে টাকাটা খরচ করবে, এই হল শর্ত।

—কিন্তু এখন ?—সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বললেন।—এখন তো খুনের দায়ে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

ছোট্ট একটু হাসলেন বুলক।

—খুন। কি বললে ? আত্মহত্যা।—বললেন বুলক।—মেয়েটি সেটাই বোঝাতে চেয়েছিল। পুলিশ রেণরের পিছু নিয়েছে। এটা সে জানত—হ্যাঁ জানত। এই হল রেণরের স্বীকারোক্তি, পরিষ্কার লেখা, সই করা। টেবিলের ওপর পড়ে ছিল।

—রেণরের স্বীকারোক্তি !—হতবাক হলেন যেন ক্লেটন।

—হ্যাঁ, তার কাহিনীও বলতে পারেন।—জবাবে বললেন বুলক। তারপর উঠে দরজা পর্যন্ত একটু পায়চারি করে এসে বললেন।—আমি পড়েছি। স্বীকারোক্তি। হ্যাঁ স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। পড়তে পড়তে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। ও-ই পুড়িয়ে মেরেছে ওর মাসি বার্থাকে, মেরে জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে

দিয়েছে হান্না মোফাতিকে, খুন করেছে কর্নেল ব্ল্যাকনেকে। এই উপন্যাসে তার সব নিখুঁত বিবরণ পাবেন।

—এই কাহিনী ছাড়াও আরও কাহিনী আছে।—কথার সঙ্গে কথা যোগ করলেন বুলক।

—মহল দেখাশোনা করত যে হান্না মোফাত, তার একটা মেয়ে ছিল। এই ডায়না হল তার সেই মেয়ে।—একটুখন থেমে আবার বলে চললেন বুলক।—ওর বাবা মেজর বার্টন, হান্নাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। তাই সে সকলকে খুন করে সাক্ষী না রেখে। বুঝতে পারলেন কিছু? চলে গিয়েছিল হক্‌লেতে। সেখানেই ডায়নার জন্ম। পরে এই মহল ছিল যাঁদের তদারকিতে তাদের কাছে আবেদন করে পরিচারিকার কাজের জন্যে। মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল আবেদন। কারো মনে কোন সন্দেহ বা প্রশ্নই জাগে নি। হান্না আবার ফিরে এল এই পুরোনো মহলে, সঙ্গে ডায়না। এখানে ডায়নার পরিচিতি হল ভাইঝি বলে। আচ্ছা, অদ্ভুত আপনাদের এই জায়গা। যাক্, এখন অন্য একটু কাজে যাচ্ছি। লণ্ডন ফিরে যাওয়ার আগে আবার দেখা করে যাব। গুড্ নাইট।

দরজা ঠেলে চলে গেলেন বুলক। সুপারিনটেনডণ্ট ক্লেটন আর সার্জেন্ট তাকিয়ে রইলেন তার গমন পথের দিকে।

বেরিয়ে যাবার পথে বলে গেলেন—মহলটা পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ডাইনিং রুমে যে আলোর কুপীটা উল্টে পড়েছিল, তার থেকেই এই কাণ্ড। একেবারে দাবানল ব্যাপার। ঠিক সময়ে ফায়ার ব্রিগেডও পৌঁছোতে পারে নি। কোন কিছু বাঁচাতেও পারে নি। ভালই হয়েছে। অমন শয়তান, রক্তখেকো, ভুতুড়ে মহল গেছে—ভালই হয়েছে। মানুষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

ছ'মাস পর।

ক্লাবঘরে বসে প্রকাশক জ্যাকর মারখাম আলোচনা করছিলেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে।

—হ্যাঁ, লণ্ডন ছাড়ার আগে রেণর যে কথাটা বলে গিয়েছিলেন, তা আজও আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বলেছিলেন, 'আমার পরের বই আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে।'

—এতটুকু মিথ্যে নয়। খুব খাঁটি কথা।—বললেন বন্ধু।—চারদিকে তো আলোড়ন তুলেছে। অস্বীকার করার উপায়নেই। আজ পর্যন্ত যত অপরাধীর আত্মজীবনী বেরিয়েছে, এটার মত কি কোনটা এমন সাড়া জাগাত পেরেছে? কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কিভাবে এটা ছাপানোর অধিকার পেলে?

—রেণর নিজেই উইলে অনুমতি দিয়ে গেছে।—বললেন মারখাম।—পাণ্ডুলিপি অবশ্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হেপাজতেই আছে। তারাই অনুমতি দিয়েছে। আমি নকল করে এনে ছেপে বের করেছি।—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

—হতভাগ্য রেণর। তাঁর সর্বনাশ হক, ক্ষতি হক, এটা আমার আদৌ কাম্য নয়। ভাবতেও পারি না। নরদামবারল্যাণ্ডের ঐ মানুষ-খেকো বাড়িটায় উনি না গেলেই পারতেন। বাড়িটা যেন মানুষ-খেকো বাঘ! যদিও শিকারকে ঠিক খায় না। তাকে যে কি পরিমান শয়তান করে তোলে তা কল্পনার অতীত!

———